আক্বায়েদ শিক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড

মূলঃ আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ তাকী মিসবাহ্ ইয়াযদী

অনুবাদঃ মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন

প্রকাশনায়ঃ

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নবুয়্যতের প্রসংগ কথা

দ্বিতীয় খণ্ড

১ম পাঠ

নবুয়্যতের প্রসংগ কথা

ভূমিকা:

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, একজন বিচক্ষণ মানুষের মত জীবন-যাপন করার নিমিত্তে যে সকল মৌলিকতম বিষয়সমূহের সমাধান করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষের জন্যেই অপরিহার্য সেগুলো নিম্নরূপ:

১। মানুষ ও বিশ্বজগতের অস্তিত্ব কার থেকে ? এবং এ গুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কার ?

২। জীবনের পরিশেষ এবং মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায় ?

৩। প্রকৃত সৌভাগ্য ও পূর্ণতালাভের জন্যে সঠিক পথের সন্ধান প্রাপ্তির উপর মানুষের যে নির্ভরশীলতা, তা কোন বিশ্বস্ত মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে? এবং তা কার নিয়ন্ত্রণাধীন ?

এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর সে মৌলিক ভিত্তিত্রয়ে (তাওহীদ, নবুয়্যত, পুনরুত্থান বা ক্বিয়ামত) বিদ্যমান, যেগুলো প্রতিটি ঐশী ধর্মেরই মৌলিকতম বিশ্বাসরূপে পরিগণিত ।

এ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমরা খোদা পরিচিতির উপর আলোচনা করেছি এবং এ উপসংহারে পৌঁছেছি যে, সকল সৃষ্ট বিষয়ই একক সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং সকলেই তারই প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে; কেউই কোন অবস্থাতে বা কোন কর্মে বা কোন স্থানে অথবা কালেই তার অমুখাপেক্ষী নয়।

এ বিষয়টিকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলাম[১] এবং উল্লেখ করেছিলাম যে, এ ধরনের বিষয়বস্তুকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই প্রমাণ করা যায়। কারণ বিশ্বাসগত পরিচিতি থেকে এবং আল্লাহর কালাম থেকে যুক্তি প্রদর্শন কেবলমাত্র তখনই যুক্তিযুক্ত হবে, যখন খোদার অস্তিত্ব, তার কালাম এবং ঐ কালামের বিশ্বাসযোগ্যতা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপাদিত

হবে। যেমন: নবী (সা.) ও ইমামগণের (আ.) বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা, তাদের নবুয়্যত ও ইমামতের প্রমাণ এবং তাদের বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।

অতএব মূল নবুয়্যতকেও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমেই প্রমাণ করা উচিৎ- যদিও পবিত্র কোরানের সত্যতা প্রমাণ করার পর আমরা এ বিষয়ের স্বপক্ষে উক্ত ঐশী উৎস থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি। অনুরূপ পুনরুত্থানের (معاد) বিষয়টিকে ওহীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে - যদিও মূল পুনরুত্থান তত্বটি, বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদ্ধৃতিগত (نقلی) উভয়ভাবেই প্রতিপাদনযোগ্য।

অতএব এ দু'টি বিষয়কে (নবুয়্যত ও পুনরুত্থান) ব্যাখ্যায়িত করার জন্য সর্বাগ্রে নবুয়্যত ও পুনরুত্থানের মূল বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। অতঃপর যখন ইসলামের প্রবর্তকের (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)) নবুয়্যত এবং পবিত্র কোরানের সত্যতা প্রতিপন্ন হবে, তখন এ দু'টি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে কোরান এবং সুন্নাহ্ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। কি পর র স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করাই উল্লেখিত বিষয় য়ের অনুধাবনের জন্যে অপেক্ষাকৃত বেশী উপযোগী ও দয়গ্রাহী। তাই প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রথমে নবুয়্যাত সম্পর্কে আলোচনা করব। অতঃপর পুনরুত্থানের বিষয়টি তুলে ধরব। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি কোন কোন ক্ষেত্রে কোন প্রামাণ্য বিষয়ের শরণাপন্ন হতে হয় তবে তাকে মূল বিষয়' হিসেবে যথাস্থানে প্রতিপাদন করব।

বিষয়বস্তুর আলোচনার উদ্দেশ্য :

এ বিষয়ের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে এবং সঠিক জীবনধারা সম্পর্কে পরিচিতি লাভের জন্যে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন অপর একটি পন্থা বিদ্যমান, যেখানে ভুল- ক্রটির কোন অবকাশ নেই। আর এ পন্থাটি হল 'ওহী' (وحی) , যা প্রকারান্তরে ঐশী শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত এবং তা আল্লাহর কোন কোন নির্বাচিত বান্দাগণের জন্যে নির্ধারিত। সাধারণ মানুষ এ ওহীর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নন। কারণ তারা এরূপ কোন দৃষ্টান্ত স্বীয় অভ্যন্তরে খুজে

পান না। তবে বিভিন্ন আলামত ও ইঙ্গিত থেকে ওহীর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হন এবং ওহী লাভ সম্পর্কে আম্বিয়াগণের (আ.) দাবির স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন। স্বভাবতঃই যখন কারও উপর ওহীর অবতরণ সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় তখন অন্যান্যদের দায়িত্ব হল তার মাধ্যমে যে নিদের্শ অবতীর্ণ হয়েছে তাকে গ্রহণ করা ও তদানুসারে কর্ম সম্পাদন করা। কেউই এ ওহীর বিরোধিতা করে অব্যাহতি পাবে না, যদি না তা কোন নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও পাত্রের জন্যে নির্ধারিত হয়।

অতএব এ খণ্ডের মূল আলোচিত বিষয়গুলো হল:

নবীগণের (আ.) নবুয়্যত ঘোষণার গুরুত্ব, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার ত্রুটি- বিচ্যুতি থেকে এ ওহীর পবিত্রতার গুরুত্ব, এমনকি মানুষের নিকট পৌঁছান অবস্থায়ও এর অবিকৃতির গুরুত্ব। অন্যকথায়:ওহীর গ্রহণ ও পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে নবীগণের (আ.) পবিত্রতার (عصمت) অপরিহার্যতা এবং তৎসম অপরের জন্যে তাদের নবুয়্যতের প্রমাণবহ পন্থার অনিবার্যতা।

বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে ওহী ও নবুয়্যতের মূল বিষয়সমূহের সমাধানের পর অন্যান্য বিষয়সমূহের পালা আসে। যেমন:নবীগণের (আ.) সংখ্যাধিক্য, ঐশী গ্রন্থসমূহ, সর্বশেষ নবী ও ঐশী গ্রন্থের নির্ধারণ, তদনুরূপ তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন।

কি এ বিষয়গুলোর সবগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্ধৃতিগত (نقلی) ও বিশ্বাসগত (تعبدی) যুক্তির অবতারণা করা অনিবার্য।

কালামশাস্ত্রে গবেষণার পদ্ধতি :

সাম্প্রতিক আলোচনার ভিত্তিতে দর্শন ও কালামশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলো সু ষ্ট হয়েছে। কারণ দর্শন শুধুমাত্র ঐ সকল বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করে থাকে, যেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপাদনযোগ্য। অপরদিকে কালামশাস্ত্র ঐ বিষয়গুলোকেই সমন্বিত করে, যেগুলো উদ্ধৃতিগত ও বিশ্বাসগত যুক্তির সাহায্য ব্যতীত প্রতিপাদন যোগ্য নয়।

অন্যকথায় : দর্শন ও কালামশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক হল, ছেদক সম্পর্ক[২] (العموم و الخصوص المطلق)। অর্থাৎ দর্শন ও কালামশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু কিছু অভিন্ন হওয়া সত্বেও (যেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণ করা হয়) উভয়েরই কিছু কিছু স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় রয়েছে। তবে দর্শনের স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়গুলো বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতেই প্রমাণিত হয়, যা কালামশাস্ত্রের অন্তর্গত আলোচ্য বিষয়ের ব্যতিক্রম। কারণ কালামশাস্ত্রের বিষয়গুলো উদ্ধৃতিগত ও বিশ্বাসগত যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। মোদ্দাকথা কালামশাস্ত্রের গবেষণা পদ্ধতি হল যুগ্ম ও সমন্বিত পদ্ধতি। এ শাস্ত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি যেমন প্রয়োগ হয়, তেমনি বিশ্বাসগত পদ্ধতিও ব্যব ত হয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, দর্শন ও কালামশাস্ত্রের মধ্যে দু'টি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যথা :

১। উভয়েই অভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের (যেমন : খোদা পরিচিতি) অধিকারী হলেও কিছু কিছু স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়ের অধিকারী, যেগুলো সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র ভিন্ন অপরটির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

২। দর্শনশাস্ত্রে সকল বিষয়কে বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়ে থাকে, যা কালামশাস্ত্রের ব্যতিক্রম - যেখানে কিছু কিছু বিষয় (যেমন : দর্শন ও কালামশাস্ত্রের অভিন্ন বিষয়সমূহ) বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে, কিছু কিছু বিষয় (যেমন : ইমামত) উদ্ধৃতিগত পদ্ধতিতে, আবার কিছু কিছু বিষয় (যেমন : পুনরুত্থানের মূল বিষয়টি) উপরোল্লিখিত এ উভয় পদ্ধতিতেই প্রমাণ করা হয়ে থাকে।

স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে, কালামশাস্ত্রের স্বতন্ত্র বিষয়সমূহ, যেগুলো উদ্ধৃতগত ও বিশ্বাসগত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, সেগুলো এক শ্রেণীর নয়। বরং একশ্রেণীর বিষয়সমূহ, বিশেষকরে রাসূল (সা.) এর উক্তি আচার-ব্যবহারের (সুন্নত) সত্যতা, প্রত্যক্ষভাবে পবিত্র কোরানের আয়াতসমূহের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে (অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে পবিত্র কোরানের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর)। অতঃপর অপর কিছু বিষয়, যেমন : হযরত রাসূল (সা.) এর উত্তরাধিকারী নির্বাচন ও পবিত্র ইমামগণের (আ.) বক্তব্যের সঠিকত্ব, মহানবী (সা.) এর বক্তব্য

থেকে প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া অন্য আর এক শ্রেণীর বিষয়সমূহ, ইমামগণের (আ.) বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়ে থাকে।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, উদ্ধৃতিগত যুক্তির মাধ্যমে যে ফলাফল অর্জিত হয় তা একমাত্র তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন এগুলোর সনদ চূড়ান্ত ও সু ষ্ট হবে।

২য় পাঠ

মানুষের জন্যে ওহী ও নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তা

নবীগণকে প্রেরণের আবশ্যকতা :

এ বিষয়টি নবুয়্যতের আলোচনার মৌলিকতম বিষয় বলে পরিগণিত। এ বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্যে এমন একটি দলিলের অবতারণা করতে হবে, যা নিম্নলিখিত ভূমিকাত্রয়ের উপর নির্ভরশীল :

১। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল এই যে, স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ড ও স্বীয় উৎকর্ষের পথ অতিক্রমের মাধ্যমে এমন চূড়ান্ত পূর্ণতা অর্জন করা, যা একমাত্র স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অর্থাৎ মানুষকে এ জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে মহান আল্লাহর উপাসনা ও আনুগত্যের মাধ্যমে তার রহমত ও অনুগ্রহভাজন হতে পারবে, যা পরিপূর্ণ মানুষের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রভুর প্রজ্ঞাপূর্ণ ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে মানুষের পূর্ণতা ও সৌভাগ্যকে সমন্বিত করেছে। কি মানুষের এ সমুন্নত ও অমূল্য সৌভাগ্য যেখানে স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ড ব্যতীত অর্জিত হয় না, সেখানে মানুষের জীবনপথ দু'ধারার সম্মুখে অবস্থান লাভ করেছে, যাতে তার জন্যে নির্বাচন ও মনোনয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং স্বভাবতঃই এদের একটি হল দুর্দশা ও শাস্তির পথ, যা সঙ্গত কারণেই (মৌলিকভাবে নয়) প্রভুর ইরাদার বিষয়ে পরিণত হয়।

এ ভূমিকাটি প্রভুর প্রজ্ঞা ও আদলের (প্রথম খণ্ডের ১১ ও ২০ নং পাঠ) আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ সু ষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

২। সচেতনভাবে স্বাধীন নির্বাচনের জন্যে, কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা ও বাস্তবে ঐ সকল কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত ক্ষেত্রের যোগান এবং ঐ গুলোর প্রতি আভ্যন্তরীণ ঝোঁক বা আকর্ষণ ছাড়াও সুকর্ম ও কুকর্ম, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত পথের সঠিক পরিচিতির প্রয়োজন। মানুষ তখনই স্বীয় উৎকর্ষের

পথকে স্বাধীন ও সচেতনভাবে নির্বাচন করতে পারবে, যখন এর উদ্দেশ্য ও এ উদ্দেশ্যে পৌছার পথ সম্পর্কে এবং এর উত্থান- পতন, ভাঙ্গা- গড়া ও ক্রুটি- বিচ্যুতি সম্পর্কে অবগত থাকবে। অতএব প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল, উল্লেখিত পরিচিতিসমূহ সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্যে উপযুক্ত মাধ্যমকে মানুষের অধিকারে প্রদান করা। নতুবা এমন কারও মত হবে যে, কোন অতিথিকে অতিথিশালায় নিমন্ত্রণ করল, অথচ ঐ অতিথিশালায় পৌছার পথ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিল না। আর এ ধরনের আচরণ নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞার পরিপন্থী ও অনাকাংখিত বলে পরিগণিত হবে।

এ ভূমিকাটির সু ষ্ট এবং অধিকতর ব্যখ্যা- বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই ।

৩। ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের সাহায্যে অর্জিত মানুষের সাধারণ ও পারিপার্শিক পরিচিতি, জীবনের প্রয়োজনসমূহ মিটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সকল প্রকারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রকৃত কল্যাণ ও পূর্ণতার পথের শনাক্তকরণের জন্যে যথেষ্ট নয়। অতএব এ ঘাটতি পূরণের জন্যে যদি অপর কোন পথ না থাকত, তবে মানব সৃষ্টির পশ্চাতে প্রভুর উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটত না।

উপরোক্ত তিনটি ভূমিকা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, সার্বিক উৎকর্ষের পথ পরিচিতির জন্যে, ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান ছাড়াও অপর একটি উপায় মানুষের অধিকারে অর্পণ করা প্রভুর প্রজ্ঞা বা হিকমতেরই দাবি; যাতে মানব সম্প্রদায় প্রত্যক্ষভাবে অথবা কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে, এ থেকে লাভবান হতে[৩] পারে আর তা হল ওহীর মাধ্যম, যা নবীগণের (সা.) অধিকারে প্রদান করা হয়েছে এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে ও অন্যান্যরা তাদের মাধ্যমে তা থেকে লাভবান হয়ে থাকে। আর এভাবে মানুষ চূড়ান্ত পূর্ণতা ও কল্যাণের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

এ ভূমিকাত্রয়ের মধ্যে শেষোক্ত ভূমিকাটি সম্পর্কে ি ধা- ন্দ্বের অবকাশ থাকতে পারে। ফলে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে আরও অধিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন মনে করছি, যাতে সার্বিক পূর্ণতার পথে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ও ওহীর উপর তার নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সু ষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়।

মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা :

সার্বিকভাবে জীবনের সঠিক কর্মসূচীর শনাক্তকরণের জন্যে মানব অস্তিত্বের প্রারম্ভ ও তার অস্তিত্বের জন্যে সম্পন্ন ক্রিয়াদি, অন্যান্য অস্তিত্বশীলের সাথে তার যে সম্বদ্ধ, একই শ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রেণীর সৃষ্ট বিষয়াদির সাথে তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তার কল্যাণ ও অকল্যাণের ক্ষেত্রে এ বহুবিধ সম্পর্কের যে প্রভাব ইত্যাদি সকল কিছু সম্পর্কে অবগত হওয়া অপরিহার্য। অনুরূপ বিভিন্ন প্রকার লাভ- ক্ষতি ও কল্যাণ- অকল্যাণ ইত্যাদির জ্ঞান লাভ ও মূল্যায়নের প্রয়োজন, যাতে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বৈচিত্রময় বিশেষত্বের অধিকারী এবং বিভিন্ন পরিবেশ ও সমাজে বসবাসকারী মিলিয়ন মিলিয়ন সংখ্যক মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। কি এ সমস্ত বিষয়াদি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ একজন বা কয়েকজনের জন্যে শুধু দুঃসাধ্যই নয় বরং শত- সহস্র সংখ্যক মানবিক বিভাগে বিশেষজ্ঞ সমষ্টিও, এ ধরণের কোন জটিল সূত্রের আবিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত নিয়মরূপে উপস্থাপন করতে অক্ষম যাতে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, বস্তুগত, মানসিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধিত হতে পারে এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের সাংঘর্ষিক পর্যায়ে (যা অধিকাংশ সময়ই পরিদৃষ্ট হয়) অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণটি অগ্রাধিকার পেতে পারে। মানব সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে নিয়ম- নীতির পরিবর্তন ধারা শত- সহস্র বিশেষজ্ঞ ও গবেষকের সহস্রাব্দীর প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলেও যে অদ্যাবধি সঠিক, পরিপূর্ণ ও সার্বিক নিয়ম- ব্যবস্থার আবিষ্কারে অপারগ তা তারই প্রমাণবহ। অনুনরূপ নীতি প্রণয়নের বিশ্বসভায় সর্বদা নিজেদের গড়া বিধানের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হয় এবং কোন না কোন ধারার রহিতকরণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংস্করণ ও পূর্ণতা বিধানে প্রয়াসী হয়।

আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবেনা যে, এ (প্রচলিত) বিধানসমূহের প্রণয়নেও প্রভুর নিয়ম ব্যবস্থা ও ঐশী বিধানের যথেষ্ট শরণাপন্ন হতে হয়েছে। অনুরূপ লক্ষ্যণীয় যে, পৃথিবীর সকল আইনবিদ ও নীতিনির্ধারকের সকল প্রচেষ্টা ও গুরুত্ব শুধুমাত্র পার্থিব ও সামাজিক কল্যাণকে ঘিরেই ছিল ও আছে এবং কখনোই পারলৌকিক কল্যাণ অথবা পার্থিব ও বস্তুগত লাভ- ক্ষতির বিষয়সমূহ

বিবেচিত হয়নি ও হয় না। আবার এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনা করতে চাইলেও কখনোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পার্থিব ও বস্তুগত কল্যাণ-অকল্যাণকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত চিহ্নিত করা গেলেও আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক কল্যাণের বিষয়াদি ঐন্দ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নির্ধারণযোগ্য নয়। তদনুরূপ ঐ গুলোর যথাযথ মূল্যায়ন এবং বস্তুগত ও পার্থিব কল্যাণের সাথে বিরোধপূর্ণ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণটিকে শানাক্তকরণও সম্ভব নয়।

এানব প্রণীত প্রচলিত নিয়ম- নীতির আলোকে শত- সহস্রাব্দী পূর্ব মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে কার্যকর ধারণা পাওয়া যেতে পারে এবং এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, প্রাথমিক যুগের মানুষ জীবনের সঠিক কর্মসূচী বিধানের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের মানুষের চেয়ে অনেক অক্ষম ছিল। আবার যদি মনেও করা হয় যে, আধুনিক যুগের মানুষ সহস্র সহস্রাব্দীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সঠিক, পূর্ণ ও ব্যাপক বিধান ব্যবস্থার জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছে এবং এ বিধান ব্যবস্থাই পারলৌকিক ও অনন্ত সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম। তথাপি এ প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় বিলয়ন বিলিয়ন মানুষকে তাদের অজ্ঞতার উপর ছেড়ে দেয়া কিরূপে প্রভুর প্রজ্ঞার সাথে ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে ?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সূচনালগ্ন থেকে শেষাবধি মানব সৃষ্টির পশ্চাতে বিদ্যমান উদ্দেশ্য তখনই বাস্তবায়নযোগ্য হবে যখন জীবনের বাস্তবতা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন অপর একটি মাধ্যমের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। আর তা ওহী ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

প্রসঙ্গক্রমে সু ষ্ট হয়েছে যে, মানব সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তিও আল্লাহর নবী হবেন। যাতে জীবনের সঠিক কর্মসূচী সম্পর্কে তিনি পরিচিতি লাভ করতে পারেন এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্বয়ং তার ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত হয় ও তৎপর অন্যান্য মানুষ তার মাধ্যমে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। আর এটা উল্লেখিত প্রমাণেরই দাবি।

নবীগণকে প্রেরণের উপকারিতা :

আল্লাহর নবীগণ মানুষের প্রকৃত পূর্ণতার সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান এবং ওহী লাভ ও মানুষের নিকট তার প্রচার ছাড়াও মানুষের উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সেগুলোকে অনুধাবন করতে সক্ষম। কি হয় যথেষ্ট সময় ও অভিজ্ঞতার অভাবে অথবা বস্তুগত বিষয়াদির প্রতি গুরুত্বারোপ ও পাশবিক প্রবৃত্তির আধিক্যের কারণে এগুলো সম্পর্কে বিস্মৃত ও অজ্ঞতায় পতিত হয় কিংবা কুশিক্ষা ও অপপ্রচারের কারণে সেগুলো লোকচক্ষুর আড়ালে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ধরনের বিষয়াদিও নবীগণ কর্তৃক বিবৃত হয় এবং উত্তর উত্তর স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সে গুলোর সার্বিক বিস্মৃতিতে বাধা প্রদান করা হয়। একই সাথে সঠিক ও যৌক্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভ্রমাত্মক যুক্তির অবতারণা ও কুশিক্ষাকে প্রতিরোধ করা হয়।

এখানেই নবীগণকে মুযাক্কির (مذكر= যিনি স্মরণ করিয়ে দেন), নাযির (نذير= ভয় প্রদর্শনকারী) এবং পবিত্র কোরানকে যিকর (ذكر=স্মরণ), যিকরা (ذكرى) ও যিকরাহ (ذكرة) নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّر و هم منسىّ نعمة و يحتجّوا عليهم بالتبليغ

আমীরুল মু' মিনীন হযরত আলী (আ.) নবুয়্যতের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বলেন : অর্থাৎ মহান আল্লাহ স্বীয় পয়গাম্বরগণকে উত্তর উত্তর প্রেরণ করেছেন যাতে ফিতরাতের বিনিময়ে মানুষকে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের জন্য আহ্বান করতে পারেন, অজস্র বিস্মৃত নিয়ামতের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এবং প্রচার ও সত্য বর্ণনা করে তাদের প্রতি দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন।

২। মানুষের পরিচর্যা, বিকাশ ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে আচরণগত আদর্শের অস্তিত্ব হল একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী, যার গুরুত্ব মনোবিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর নবীগণ পরিপূর্ণ মানুষ ও

ঐশী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বোত্তমভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন এবং মানুষকে বিভিন্ন মুখি শিক্ষা ও জ্ঞানদান ছাড়াও তাদের প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধিতেও ভূমিকা রাখেন। আমরা জানি যে, পবিত্র কোরানে 'প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধি' শব্দ য় যুগ্মভাবে স্মরণ করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধিকে (تذكيه) , এমনকি প্রশিক্ষণের (تعليم) উপরও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৩। মানব সমাজে নবীগণের উপস্থিতির অপর একটি সুফল হল, তারা উপযুক্ত পরিস্থিতিতে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন। নিঃসন্দেহে পবিত্র ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব হল, কোন সমাজের জন্যে মহান প্রভুর এক পরম অনুগ্রহ, যার মাধ্যমে নানা প্রকার সামাজিক অসঙ্গতি ও অনাচারের প্রতিরোধ করা হয় এবং সমাজ বিরোধ, বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলতা থেকে মুক্তি পায়। আর এ ভাবেই সমাজ বাঞ্ছিত পূর্ণতা ও উৎকর্ষের দিকে পরিচালিত হয়।

৩য় পাঠ

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব :

নবুয়্যতের অপরিহার্যতা সম্পর্কে যে প্রমাণটি উপস্থাপন করা হয়েছে তার উপর একাধিক প্রশ্ন ও ি ধা- ন্দ্বের অবকাশ থাকতে পারে। এখন আমরা সেগুলোর অবতারণা ও উত্তর দানের চেষ্টা করব :

১। যদি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি এটাই হয় যে, নবীগণের নবুয়্যতের মাধ্যমে সকল মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হবে, তবে কেন তাদের সকলেই এক বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানে প্রেরিত হয়েছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান এ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে? বিশেষ করে প্রাচীনকালে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংবাদ আদান-প্রদানের মাত্রা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ, ধীর গতির এবং সম্ভবতঃ এমন কোন জাতি বা গোষ্ঠী থাকতে পারে যারা নবীগণের আহ্বান সম্পর্কে কোনভাবেই অবগত ছিল না।

জবাব : প্রথমতঃ নবীগণের আবির্ভাব কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং পবিত্র কোরানের আয়াত থেকে আমরা এ প্রমাণ পাই যে, প্রতিটি গোত্র ও জাতির জন্যেই কোন না কোন নবী ছিলেন। যেমন :

(وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ)

এবং এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সর্তককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরাঃ ফাতির - ২৪) অনুরূপ,

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)

এবং আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরাঃ নাহল- ৩৬)

পবিত্র কোরানে যদিও মুষ্টিমেয় কিছু নবীগণের (আ.) নাম উল্লেখ হয়েছে, তবে তার অর্থ এ নয় যে, নবীগণের সংখ্যাও তা-ই ছিল। বরং স্বয়ং পবিত্র কোরানেই সু ষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, এমন অনেক নবী ছিলেন যাদের নাম এ পবিত্র কিতাবে উল্লেখ হয়নি। যেমন :

(وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ)

এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। (সূরা : নিসা ১৬৪)

িতীয়ত : উল্লেখিতি প্রমাণটির দাবি ছিল এই যে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি বহির্ভূত অপর কোন মাধ্যমও থাকা উচিৎ, যার মাধ্যমে মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। কি হিদায়াত প্রাপ্তি দু'টি শর্তে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাস্তবরূপ লাভ করে থাকে। একটি হল : ব্যক্তি স্বয়ং প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত এ নিয়ামত বা অনুগ্রহ থেকে লাভবান হতে চাইবেন। অপরটি হল : অন্যরা এ হিদায়াতের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছাচারিতার কারণে হিদায়াত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তেমনি অপর সিংহভাগ আবার প্রচারের প্রসারে প্রতিবন্ধকতার ফলে বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা জানি আল্লাহর প্রেরিত পূরুষগণ এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্যে সদা সচেষ্ট ছিলেন এবং আল্লাহর শক্রদের সাথে, বিশেষ করে শক্তিধর ও দাম্ভিকদের সাথে সংগ্রামরত ছিলেন। আর আল্লাহর বাণী প্রচার ও মানুষকে হিদায়াতের পথে নবীগণের মধ্যে অনেকেই নিজ জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি অনুসারী ও সহযোগী সংগ্রহ করতে পারতেন তবে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আর এ অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শ্রেণীই হল ীনের প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, মানবীয় উৎকর্ষের পথ স্বাধীন নির্বাচনাধীন হওয়ার অপরিহার্য অর্থ হল : এ সকল ঘটনাগুলো এমনভাবে রূপ পরিগ্রহ করবে যে, সুপথ ও কুপথের নির্বাচনের ক্ষেত্রে

সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। তবে স্বৈরাচারী ও মিথ্যাবাদীর প্রভাব যদি এমন স্থানে পৌছে যে, অপরের হিদায়াতের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং কোন সমাজে সত্যের আলোকবর্তিকা সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয়ে যায় তবে ঐ অবস্থায় মহান আল্লাহ কোন না কোন অদৃশ্য উপায়ে ও অসাধারণ পথে সত্যের অনুসারীগণকে সাহায্য করে থাকেন।

সিদ্ধান্ত : যদি এ ধরনের কোন প্রতিবন্ধকতা নবীগণের (আ.) প্রচারের পথে না থাকত তবে তাদের আহ্বান সকল বিশ্ববাসীর কর্ণগোচর হত এবং ওহী ও নবুয়্যতের মাধ্যমে এ হিদায়াতের ঐশী অনুগ্রহ থেকে উপকৃত হত। অতএব অধিকাংশ মানুষের হিদায়াত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার অপরাধ তাদের উপরই বর্তায়, যারা নবীগণের আহ্বানের এবং প্রচার ও প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

২। যদি নবীগণ মানব সম্প্রদায়ের উৎকর্ষের পথকে সুগম করার জন্যে নবুয়্যত লাভ করে থাকেন তবে কেন তাদের আগমন সত্ত্বেও এত অপরাধ ও অনাচারের উদ্ভব হয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ সময়ই কুফর ও গুণাহে লিপ্ত হয়েছে; এমনকি ঐশী ধর্মসমূহের অনুসারীদের পর রের মধ্যেও শত্রুতা ও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ- বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে? মহান প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি কি এটা ছিল না যে, মহান আল্লাহ অন্য কোনভাবে এ সকল অনাচার ও বিশৃংখলার পথ রোধ করবেন যাতে ন্যূনতমপক্ষে ঐশীধর্মসমূহের অনুসারীগণ পর র কলহে লিপ্ত না হয়?

জবাব : মানুষের স্বাধীন বিশেষত্বযুক্ত উৎকর্ষের উপর চিন্তা করলে উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব ষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কারণ, যেমনটি বলা হয়েছে যে, প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল স্বাধীনভাবে (বাধ্যতামূলক নয়) উৎকর্ষ লাভের সকল ক্ষেত্র ও শর্তের যোগান দিবেন যাতে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ সত্যপথ শনাক্ত করতঃ সে পথ পরিক্রমণের মাধ্যমে উৎকর্ষ ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। কি এ ধরনের উৎকর্ষের জন্যে শর্ত ও কারণের উপস্থিতির অর্থ এ নয় যে, সকল মানুষ ঐগুলোর স ্যবহার করে বাধ্যতামূলক সঠিক পথ বেছে নিবে। পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যানুসারে, মহান আল্লাহ মানব সম্প্রদায়কে সঙ্গত শর্তেই এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যে, তাদের মধ্যে কারা

উত্তম কর্ম সম্পাদন করে তা পরীক্ষা করবেন।[৪] অনুরূপ পবিত্র কোরানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, যদি মহান আল্লাহ চাইতেন তবে সকলকেই সরল পথে পরিচালনা করতে পারতেন এবং বিচ্যুতি ও বক্রতার পথকে সম্পূর্ণরূপে রোধ করতে পারতেন।[৫] কি এ অবস্থায় নির্বাচনের কোন সুযোগই অবশিষ্ট থাকত না এবং মানুষের আচরণ মানবিক মূল্যবোধ বর্জিত হত। আর সেই সাথে স্বাধীন ও নির্বাচন ক্ষমতার অধিকারী মানব সৃষ্টির পথে প্রভুর উদ্দেশ্য ব্যাহত হত।

সিদ্ধান্ত : অন্যায়, ব্যভিচার, কুফর ও গুণাহের প্রতি মানুষের ঝোঁক হল ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতারই প্রমাণবহ। আর এ ধরনের অসদাচরণের ক্ষমতা তার সৃষ্টি রহস্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং ঐগুলোর আনুসঙ্গিক ফলাফল, তাদেরই অনুগামী। প্রভুর ইরাদা মূলতঃ মানুষের উৎকর্ষকেই সমন্বিত করলেও, যেহেতু এ সমন্বয় স্বাধীনতার শর্তাধীন, সেহেতু স্বেচ্ছাচারিতা থেকে উৎসারিত অধঃপতন ও বিচ্যুতিকে প্রতিহত করে না। সর্বোপরি প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি এ নয় যে, চাক বা না চাক স্বীয় চাওয়া পাওয়া ও ইরাদার বিরুদ্ধে সঠিক পথে পরিচালিত হবে ।

৩। প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল এই যে, মানব সম্প্রদায় অধিকতর ও উত্তমরূপে উৎকর্ষ ও সৌভাগ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। তাহলে এটাই কি শ্রেয়তর নয় যে, মহান আল্লাহ প্রকৃতির রহস্যসমূহকে ওহীর মাধ্যমে মানুষের নিকট প্রকাশ করবেন যাতে বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত লাভ করে মানুষ স্বীয় উৎকর্ষের পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে? যেমনকরে গত কয়েক শতাব্দীতে অনেক প্রাকৃতিক শক্তি, কারণ ও দৈনন্দিন সামগ্রীর আবিষ্কার সভ্যতার বিকাশে বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেছে এবং শারীরিক সুস্থতা ও বিভিন্ন ব্যাধির বিরুদ্ধে সংবাদ বিনিময়, যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অমূল্য পরিবর্তন এনেছে। এটা অনস্বীকার্য যে, নবীগণ জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের মাধ্যমে ও সুখ- শান্তির উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে যদি মানুষকে সাহায্য করতেন তবে নিজেদের সামাজিক প্রভাব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উত্তমরূপে তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পারতেন।

জবাব : ওহী ও নবুয়্যতের মূল প্রয়োজন ঐ সকল ক্ষেত্রেই, যেখানে মানুষ পরিচিতির সাধারণ মাধ্যম ারা ঐগুলোকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয় এবং ঐগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে প্রকৃত

উৎকর্ষের পথ নির্ধারণ করে সে পথ পরিক্রমণে অপারগ হয়। অন্যকথায় : নবীগণের (আ.) মূল দায়িত্ব এই যে, মানব সম্প্রদায়কে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবার ও উৎকর্ষ লাভের পথে সহায়তা করা যাতে সর্বাবস্থায় স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছতে তাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে সক্ষম হয় - হোক সে যাযাবর সম্প্রদায় ও খিমাবাসী কিংবা হোক মহাসাগর অভিযাত্রী ও মহাকাশচারী। কি   তাদেরকে মানুষের প্রকৃত মূল্যবোধসমূহ সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হবে মহান আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের কী কর্তব্য রয়েছে, কী দায়িত্ব রয়েছে তাদের পর   রের প্রতি কিংবা স্বগোত্রের ও অন্য গোত্রের সৃষ্টের প্রতি, যাতে ঐ কর্তব্যগুলো যথাস্থানে সম্পাদনের মাধ্যমে প্রকৃত উৎকর্ষ ও অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। অপরদিকে শক্তি ও সামর্থ্যরে বিভিন্নতা, প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা কোন বিশেষ সময়ে বা বিভিন্ন কালে, কোন বিশেষ কারণানুসারে প্রকাশ লাভ করে এবং প্রকৃত উৎকর্ষ ও চিরন্তন ভাগ্যলিপির ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে না। যেমন : আজকের যুগের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বস্তুগত ও পার্থিব উন্নয়নের কারণ হলেও, মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

সিদ্ধান্ত : প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল এই যে, মানব সম্প্রদায় বস্তুগত বৈভবসমূহকে ব্যবহার করে পার্থিব জীবন নির্বাহ করবে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ওহীর মাধ্যমে স্বীয় পরিক্রমণের পথকে প্রকৃত উৎকর্ষ ও চিরন্তন সৌভাগ্যের দিকে পরিচালিত করবে। কি   শারীরিক ও আত্মিক সামর্থের বিভিন্নতা; অনুরূপ প্রাকৃতিক ও সামাজিক শর্তসমূহের বৈচিত্রময়তা; তদনুরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান থেকে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে সাতন্ত্রিকতা ইত্যাদি একাধিক কারণ ও সুনিদিষ্ট শর্তের অধীন, যা কার্যকারণ বিধি মোতাবেক উৎপত্তি লাভ করে। আর এ বিভিন্নতা, মানুষের চিরন্তন ভাগ্যলিপি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করে না । বরং তা কতইনা উত্তম যে, কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি এক অনাড়ম্ভর জীবনাতিবাহিত করেছেন এবং বৈষয়িক ও পার্থিব বৈভব থেকে ন্যূনতম স্বাদ গ্রহণ করেছেন। আর এমতাবস্থায় উৎকর্ষ ও সৌভাগ্যের সমুন্নত শিখরে স্থান লাভ

করেছেন। অপরদিকে কতইনা হতভাগ্য সে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর, যারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও জীবন উপকরণের অধিকারী হওয়া সত্বেও অকৃতজ্ঞতা, দাম্ভিকতা ও অপরের প্রতি অত্যাচার ও অন্যায়ের ফলে নিকৃষ্টতম নরকে পতিত হয়েছে।

তবে আল্লাহ প্রেরিত পূরুষগণ মূল দায়িত্ব পালন (অর্থাৎ প্রকৃত উৎকর্ষ ও অনন্ত সৌভাগ্যের পথে পরিচালনা) ব্যতীত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পার্থিব জীবন-যাপনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন এবং যেখানেই প্রভুর প্রজ্ঞা প্রয়োজন মনে করেছে সেখানেই কিছুটা হলেও অজ্ঞাত বাস্তবতা ও রহস্যের পর্দা উম্মোচন করেছে, যেমনটি হযরত দাউদ (আ.), সোলায়মান (আ.) ও যুলক্বারনাইনের (আ.) জীবদ্দশায় পরিলক্ষিত হয়।[৬] এ ছাড়া আল্লাহর নবীগণ সমাজের তত্ত্বাবধান ও সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রেও সচেষ্ট ছিলেন -যেমনটি হযরত ইউসূফ (আ.) মিশরে সম্পাদন করেছিলেন।[৭] কি এ সমুদয় কর্মের সবগুলোই ছিল তাদের মূল দায়িত্ব ভিন্ন বাড়তি খেদমত ।

অনুরূপ আল্লাহর নবীগণ তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কোন বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রয়োগ করেননি সেক্ষেত্রে বলতে হয় : নবীগণের (আ.) মূল লক্ষ্য (যেমনটি ইতিপূর্বেও একাধিকবার বলা হয়েছে) সচেতন ও স্বাধীনভাবে নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। আর যদি বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিপ্লব করতে চাইতেন তবে মানুষের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক বিকাশলাভ ও স্বাধীনভাবে উৎকর্ষ লাভ ঘটত না। বরং জনগণ শক্তি ও চাপের নিকট আত্মসমর্পণ করে তাদের অনুসরণ করত -- প্রভুর প্রতি অনুরাগবশতঃ ও স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে নয়। আমীরুল মু' মেনীন আলী (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন :

যদি মহান আল্লাহ চাইতেন তবে নবীগণের আবির্ভারের সময় তাদের জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণিমুক্তার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিতেন, ফল-মূলে পরিপূর্ণ বাগান তাদের অধিকারে প্রদান করতেন এবং আকাশে উড্ডয়নরত পক্ষীকুল ও ভূমিতে বিচরণরত সকল কিছুকেই তাদের সেবায় নিয়োজিত করতেন। আর যদি তা-ই করতেন তবে পরীক্ষা ও পুরস্কারের ক্ষেত্র ব্যাহত হত এবং যদি চাইতেন নবীগণকে এমন দুর্লভ ক্ষমতা ও অটুট সম্মান, রাজ্য ও শাসনক্ষমতার

অধিকারী করতেন যে, অন্যান্যরা লোভ ও ভীতির বশবর্তী হয়ে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করবে এবং দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে দূরে থাকবে, তবে ঐ অবস্থায় প্রবৃত্তি ও মূল্যবোধসমূহ এক সমান হত। কি মহান আল্লাহ এমনটি চেয়েছেন যে, নবীগণের (আ.) অনুসরণ, তাদের কিতাবসমূহকে স্বীকার করা ও তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ নিখুতভাবে ও একমাত্র খোদাপ্রীতির ফলেই ঘটবে। আর পরীক্ষা যত বৃহত্তর হবে, প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার ও প্রতিদানের পরিমাণও ততবেশী বৃদ্ধি পাবে।[৮] তবে যদি কোন জনসমষ্টি স্বাধীন নির্বাচন ও অনুরাগের বশবর্তী ও সত্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহর অনুগত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐশী উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে বিশেষ করে অন্যায়, অত্যাচার নির্মূল করার জন্য ও মু' মেনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে বিভিন্ন শক্তি ও প্রতিপত্তির আশ্রয় নেয়, তবে তা অনাকাংখিত হবে না; যার উদাহরণ হযরত সোলায়মানের (আ.) শাসন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।[৯]

৪র্থ পাঠ

নবীগণের পবিত্রতা

ওহী যেকোন প্রকার বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকার অপরিহার্যতা :

প্রয়োজনীয় পরিচিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ তার ঘাটতি পূরণের জন্যে ওহীর অপরিহার্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর, অন্য একটি বিষয়ের অবতারণা হয়ে থাকে। আর তা নিম্নরূপ :

যেহেতু সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিতির এ মাধ্যম থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব নয় বা প্রভুর পক্ষ থেকে ওহী লাভ করার কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতা তাদের নেই, পবিত্র কোরাণ এ প্রসঙ্গে বলে :

(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ)

অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবহিত করবেন না; তবে আল্লাহ্ তার রাসূরগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। (সূরা আলে ইমরান - ১৭৯)

সেহেতু আল্লাহর বাণী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের (নবীগণ) মাধ্যমে মানুষের নিকট পৌছানো অনিবার্য। কি এ ধরণের বাণীর সত্যতার কী নিশ্চয়তা রয়েছে কোথা থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে, স্বয়ং পয়গাম্বর (আ.) সঠিকভাবে উক্ত ওহী গ্রহণ ও মানুষের নিকট পৌছিয়েছেন? অনুরূপ যদি আল্লাহ এবং নবীর মধ্যে কোন মাধ্যমের অস্তিত্ব থাকে তিনি ও সঠিকরূপে এ ওহী বহন করেছেন, তার কী নিশ্চয়তা রয়েছে? কারণ ওহীর মাধ্যম তখই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে ও মানুষের জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে যখন তা প্রেরণের পর্যায় থেকে শুরু করে মানুষের নিকট পৌছা পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত যে কোন প্রকারের ত্রুটি- বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকবে। নতুবা মাধ্যমের ভুল- ভ্রান্তি ও অসারতার সম্ভাবনার ার উন্মুক্ত হয় এবং এর বিশ্বস্ততা

হারানোর কারণ হয়। অতএব কোন পথে এ নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে যে, আল্লাহর বাণী সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক রূপে মানুষের নিকট পৌছেছে?

ওহীর স্বরূপ যখন মানুষের নিকট অজ্ঞাত থাকে এবং ওহী লাভের জন্যে যখন কোন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তার না থাকে, নিঃসন্দেহে তখন কাজকর্মের সঠিকতার জন্যে নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধানের কোন পন্থা থাকে না। শুধুমাত্র ঐ অবস্থায়ই বুঝতে পারবে যে বিষয়বস্তুতে কোন ব্যতিক্রম রয়েছে যখন তা নিশ্চিত বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়মের পরিপন্থী হবে। যেমন : কেউ দাবি করল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিকট বাণী এসেছে যে, বিপ্রতী প য়ের সমষ্টি বৈধ বা অনিবার্য কিংবা (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন) আল্লাহর পবিত্র সত্তার এশধিকত, যৌগিকত ও বিলুপ্তি সম্ভব ইত্যাদি। তবে বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চিত রূপে এগুলোর বাতুলতা প্রমাণ করতঃ তার দাবির অসারতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম। কি ওহীর প্রয়োজনীয়তা ঐ সকল বিষরের ক্ষেত্রেই ব্যক্ত হয়, যেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ঐ বিষয়গুলোকে প্রমাণ করার কোন পথ খুঁজে না পায় এবং বিষয়বস্তুর মূল্যায়ণের মাধ্যমে ঐ গুলোর সত্যতা বা অসত্যতা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। আর এ সকল ক্ষেত্রে কোন পথে ওহীর বিষয়বস্তুর সত্য প্রমান এবং ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার ত্রুটি- বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত বলে প্রতিপাদন করা যেতে পারে ?

জবাব : যেমনিকরে প্রভুর প্রজ্ঞাকে বিবেচনা করে বুদ্ধিবৃত্তি (িতীয় খণ্ডের ২ নং পাঠে উপস্থাপিত দলিল অনুসারে) অনুধাবন করতে পারে যে, বাস্তবতা সম্পর্কে পরিচিত লাভ ও কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্যে অন্য কোন পন্থা থাকতে হবে - যদিও এর স্বরূপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞাতব্য না হয়। আর এ ভাবেই বুদ্ধিবৃত্তি উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর বাণী নির্ভুল ও অবিচ্যুত অবস্থায় মানুষের নিকট পৌছবে - এটাই হল মহান প্রভুর প্রজ্ঞা বা হিকমাতের দাবি। নতুবা উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

অন্যভাবে বলা যায় : আল্লাহর বানী এক বা একাধিক মাধ্যমে মানুষের নিকট পৌছানো উচিৎ যাতে স্বাধীন ভাবে উৎকর্ষ লাভের ক্ষেত্র প্রস্তত হয় ও মান সৃষ্টির পশ্চাতে বিদ্যমান প্রভুর উদ্দেশ্য

বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে - এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পর প্রভুর পূর্ণতম গুণের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, তার ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকবে। কারণ যদি মহান আল্লাহর কামনা এই না হয় যে, তার বাণীসমূহ নির্ভুল ও সঠিকভাবে বান্দাদের নিকট পৌছবে, তবে তা তারই প্রজ্ঞার পরিপন্থী হবে। আর প্রভুর প্রজ্ঞাময় ইরাদা এটাকে অস্বীকার করে। আবার যদি মহান আল্লাহ অবগত না থাকেন যে, স্বীয় বাণীকে কোন পথে ও কার মাধ্যমে প্রেরণ করবেন যাতে নির্ভুল ও অবিচ্যুত অবস্থায় মানুষের নিকট পৌছবে, তবে তা তার অশেষ জ্ঞানের পরিপন্থী হবে। অনুরূপ যদি কোন উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচন করতে ও তাকে শয়তানী আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, তবে তা তার অসীম ক্ষমতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হবে না।

অতএব মহান আল্লাহ যেহেতু সব কিছুর উপর জ্ঞান রাখেন, সেহেতু এটা অসম্ভব যে, এমন কোন মাধ্যম নির্বাচন করেছেন যে, তার ভুল- ত্রুটি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। পবিত্র কোরানে এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে যে,

(اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)

আল্লাহ তার রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন।(সূরা আন্‌আম - ১২৪)

অনুরূপ প্রভুর অসীম পরাক্রমের কথা বিবেচনা করলে এ সম্ভাবণা ও থাকে না যে, তিনি তার বাণীকে শয়তানের প্রভাব থেকে সংরক্ষণ করতে অপারগ ছিলেন। পবিত্র কোরান এ সম্পর্কে বলে :

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا)

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না, তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছেন কিনা তা জানার জন্য; রাসূলগণের

নিকট যা আছে তা তার জ্ঞানগোচরে এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। (সূরা জিন্ন ২৬ - ২৮)

তাদনুরূপ প্রভুর প্রজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, তিনি চাননি, তার বাণীকে ত্রুটি- বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষণ করতে, এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র কোরাণের বাণী এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

(لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)

যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য ষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যসত্য ষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে। (সূরা আনফাল - ৪২)

অতএব প্রভুর জ্ঞান, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার দাবি এই যে, মহান আল্লাহ স্বীয় বাণীকে সঠিক ও অবিচ্যুত অবস্থায় মানুষের নিকট পৌছে দিবেন। আর এভাবে ওহীর অবিচ্যুত ও সংরক্ষিত থাকা, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হল।

উল্লেখিত যুক্তির মাধ্যমে ফেরেস্তাগণ অথবা ওহী বহনকারী ফেরেস্তাগণ পবিত্র ওহীর গ্রাহক হিসেবে নবীগণের পবিত্রতা প্রমাণিত হয়। তদনূরূপ ওহী প্রচারের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত যে কোন প্রকার ভুল- ত্রুটি থেকে তাদের সংরক্ষিত থাকার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। অপরদিকে ওহী বহণকারী ফেরেস্তার বিশ্বস্ততা, আল্লাহর আমানত রক্ষায় তার পারংগমতা, শয়তানদের প্রভাবকে প্রতিহত করা, নবীগণের বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি মানুষের নিকট পৌছানো পর্যন্ত ওহীর পবিত্রতার সংরক্ষণের ব্যাপারে কোরানের গুরুত্বারোপের বিষয়টি সু ষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় ।[১০]

অন্যান্য ক্ষেত্রে পবিত্রতা :

উল্লেখিত যুক্তির ভিত্তিতে ফেরেস্তাগণ ও নবীগণের (আ.) যে পবিত্রতা প্রতিপন্ন হয়েছে তা ওহীর প্রাপ্তি ও প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কি পবিত্রতা প্রমানের জন্যে আরো কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো এ বিভক্ত করা যায় :

১। ফেরেস্তাগণের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়

২। নবীগণের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়

৩। অন্যান্য কিছু ব্যক্তিবর্গের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়, যেমন : পবিত্র ইমামগণ(আ.) ফাতিমা যাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের পবিত্রতা।

ওহী গ্রহণ ও বহনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ফেরেস্তাগণের পবিত্রতার ব্যাপারে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে : একটি হল ঐ সকল ক্ষেত্রে ওহীর ফেরেস্তাগণের পবিত্রতা, যা ওহীর গ্রহণ ও পৌছানোর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং আপরটি হল অন্যান্য ফেরেস্তাগণ, যাদের ওহী সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে কোন প্রকারের সংশ্লিষ্টতা নেই। যেমন : রিযক সংশ্লিষ্ট আ'যল লিপিবদ্ধ করণ সংশ্লিষ্ট, রূহ পুণঃগ্রহণ সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি ফেরেস্তাগণ।

রিসালাত সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল বিষয়ে নবীগণের পবিত্রতার ক্ষেত্রে ও দু'টি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য : একটি হল সকল প্রকার ইচ্ছাকৃত গুনাহ থেকে নবীগণের পবিত্রতা সংক্রান্ত ব্যাপার অপরটি হল যে কোন প্রকার ভুল- ত্রুটি থেকে তাদের পবিত্র সংক্রান্ত ব্যাপার। ঠিক এ দু'টি বিষয়কেই নবী নন এমন কারও ক্ষেত্রেও আলোচনা করা যেতে পারে।

যা হোক ওহীর গ্রহণ ও বহণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ফেরেস্তাগণের পবিত্রতার বিষয়টি তখই বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রতিপাদনযোগ্য হবে যখন ফেরেস্তাগণের স্বরূপ সম্পর্কে জানা যাবে। কি তাদের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা যেমন সহজসাধ্য নয়; তেমনি তা এ আলোচ্য বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ও নয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে শুধুমাত্র ফেরেস্তাগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারী পবিত্র কোরানের দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েই তুষ্ট থাকব। যথা :

(بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ)

তারা তো তার সম্মানিত বান্দা। তারা আগে ভাগে কথা বলে না; তারা তো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (সূরা আম্বিয়া- ২৬, ২৭)

(لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)

(ফেরেস্তাগণ) যারা অমান্য করে না, আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। (সূরা তাহরীম - ৬)

উক্ত আয়াত য় এ ব্যাপারে সু ষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, ফেরেস্তাগণ আল্লাহর সম্মানিত বান্দা যারা শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশেই তাদের কর্ম সম্পাদন করেন এবং কখনোই তার আদেশ লংঘন করেন না। যদিও সকল ফেরেস্তার ক্ষেত্রে উক্ত আয়াত য়ের সার্বজনীন তার ব্যাপারটি আলোচনা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে, তবু ঐগুলো ফেরাস্তাগণের পবিত্রতাকে প্রতিপাদন করে।

নবীগণ ব্যতীত অন্য মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিবর্গের পবিত্রতার ব্যাপারটি ইমামতের আলোচনার সাথে অধিকতর সাযুজ্যপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোন থেকে এখানে আমরা নবীগনের পবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের আলোচনায় মনোনিবেশ করব। যদি ও এ বিষয়গুলোর কোন কোন টিকে শুধুমাত্র উদ্ধৃতিগত ও বিশ্বাসগত দলিলের মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিতাব ও সুন্নাহর প্রমাণিত হওয়ার পরই এর অবতারণা করা উচিৎ কি আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্যে ঐগুলোকে এখানেই আলোচনা করব। তবে কিতাব ও সুন্নাহর বৈধতাকে মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে যথাস্থানে তা প্রতিপান করব।

নবীগণের পবিত্রতা :

গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে নবীগণ কতটা পবিত্র সে সম্পর্কে মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিশ্বাস যে, নবীগন। াদশ ইমামিয়া শিয়াদের বিশ্বাস যে, নবীগণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছোট বড় সকল গুনাহ থেকে পবিত্র এবং এমনকি ভুলক্রমেও তাদের ারা কোন প্রকার গুনাহ সংঘটিত হয় না। কি কোন কোন গোষ্ঠীর মতে নবীগণ শুধুমাত্র বড় গুণাহসমূহ থেকে পবিত্র, আবার কেউ কেউ বয়ঃপ্রাপ্তি (بلوغ) থেকে পবিত্র মনে করেন, কেউবা আবার নবুয়্যত লাভ থেকে। সুন্নী সম্প্রদায়ের (হাশভিয়্যাহ ও কোন কোন আহলে হাদীস) কোন কোন গোষ্ঠী মূলত : নবীগণের

পবিত্রতাকেই অস্বীকার করেছেন এবং যে কোন প্রকারের গুনাহে লিপ্ত হওয়াকে এমনকি নবুয়্যতের সময় ও ইচ্ছাকৃতভাবেও সম্ভব বলে মনে করেছেন।

নবীগণের পবিত্রতাকে প্রমান করার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা প্রয়োজন মনে করি:

প্রথমত : নবীগণের এবং কোন কোন ব্যক্তিবর্গের পবিত্র থাকার অর্থ শুধুমাত্র গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা নয়। কারণ হতে পারে কোন সাধারণ মানুষও গুনাহ লিপ্ত হয় না, বিশেষ করে যদি আয়ুষ্কাল ক্ষুদ্র হয়। বরং এর অর্থ হল : ব্যক্তি দৃঢ় আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান যে, কঠিন সংকটময় মুহূর্তেও তা তাকে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে আর এ আত্মিক দৃঢ়তা গুনাহের কুৎসিত রূপ সম্পর্কে সার্বক্ষণিক পূর্ণ সচেতনতা ও কুমন্ত্রণাযুক্ত প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় সংকল্প থেকে অর্জিত হয়। যেহেতু এ ধরণের আত্মিক দৃঢ়তা একমাত্র মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে বাস্তব রূপ লাভ করে, সেহেতু এর কর্তৃত্ব মহান আল্লাহরই। নতুবা এমনটি নয় যে, মহান আল্লাহ পবিত্র ব্যক্তিগণকে বাধ্যতামূলকভাবে গুনাহ থেকে বিরত রাখেন এবং তার স্বাধীনতাকে হরণ করেন।

যারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা অর্থাৎ নুবয়্যত বা ইমামতের অধিকারী তাদের পবিত্রতাকে অন্য এক অর্থে মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়। আর তা এই যে, মহান আল্লাহ তাদের পবিত্রতার নিশ্চয়তা বিধান করেছেন।

িতীয়ত : কোন ব্যক্তির পবিত্রতার অপরিহার্য অর্থ হল, যে সকল কর্ম তার জন্যে নিষিদ্ধ সেগুলোকে বর্জন করা। যেমনঃ যে সকল গুনাহ সকল শরীয়তে নিষিদ্ধ ও যে সকল কর্ম সম্পাদনের সময় স্বীয় সংশ্লিষ্ট শরীয়তে নিষিদ্ধ সেগুলোকে ত্যাগ করা। অতএব যে সকল কর্ম স্বীয় শরীয়তে এবং তার নিজের জন্যে বৈধ এবং তার পূর্ববর্তী শরীয়তে নিষিদ্ধ ছিল এবং পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হবে, সে সকল কর্ম সম্পাদনে কোন নবীর পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয় না।

তৃতীয়ত : গুনাহ যা থেকে স্বয়ং মা'চুম পবিত্র, তা এমন কর্ম যে, তাকে হারাম (حرام) বলে প্রকাশ করা হয়। তদনূরূপ এমন কর্ম যাকে ওয়াজেব (واجب) বলে প্রকাশ করা হয় তাকে ত্যাগ করার

অর্থও গুনাহ। কি গুনাহ শব্দটি ও তার সমার্থক শব্দসমূহের যেমন : জাম্ব (ذنب) ই'সিয়ান (عصيان) ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তৃততর অর্থে ব্যব ত হয়, যা তারকে আউলাকেও (ترک الاولی) অন্তর্ভুক্ত করে । আর এ ধরনের গুণাহে লিপ্ত হওয়া ই'সমাত (عصمة) বা পবিত্রতা বহির্ভূত নয়।

৫ম পাঠ

নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে দলিলসমূহ

ভূমিকা :

ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত যে কোন প্রকার গুনাহ থেকে নবীগণের পবিত্রতার বিশ্বাস হল, শিয়া সম্প্রদায়ের দৃঢ় ও প্রসিদ্ধতম বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যা পবিত্র ইমামগণ (আ.) তাদের অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে এর বিরোধীদের সাথে তর্ক- বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। এ বিষয়ের উপর তাদের বিতর্কের মধ্যে প্রসিদ্ধতম একটি হল, ইমাম রেজার (আ.) বিতর্ক যা হাদীস গ্রন্থসমূহ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত আছে।

তবে মোবাহের (مباح) (অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল কাজ করলে ছওয়াব বা গুনাহ কোনটিই নেই) ক্ষেত্রে ইমামগণের ভুল- ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে কম- বেশী মতপার্থক্য বিদ্যমান এবং এ প্রসঙ্গে আহলে বাইতের (আ.) নিকট থেকে বিবৃত রেওয়ায়েত ও মতবিরোধ বিবর্জিত নয়। আর এগুলোর উপর গবেষণার জন্যে বিস্তৃত সময়ের প্রয়োজন। তাই যে কোন ভাবেই হোক না কেন একে (মোবাহের ক্ষেত্রে ত্রুটিহীন) অপরিহার্য বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভূক্ত করা যায় না।

নবীগণের (আ.) পবিত্রতার (عصمت) স্বপক্ষে যে সকল দলিলের অবতারণা করা হয়, সেগুলোকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : একটি হল বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ এবং অপরটি হল উদ্ধৃতিগত (نقلی) দলিলসমূহ। যদিও উদ্ধৃতিগত দলিলসমূহের আস্থাশীলতা অধিকতর, তবু আমরা এখানে দু'টি বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল উপস্থাপনে প্রয়াসী হব। অতঃপর কোরান থেকে কিছু দলিল উপস্থাপন করব।

নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ :

গুনাহ থেকে নবীগণের (আ.) অনিবার্য পবিত্রতার স্বপক্ষে প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলটি হল : নবীগণের নবুয়্যত লাভের মূল উদ্দেশ্যই হল, মানুষের জন্যে প্রভু কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন ও সত্যের পথে মানুষকে পরিচালিত করা। প্রকৃতপক্ষে তারাই হলেন মানুষকে সঠিক পথে হিদায়াতের জন্যে প্রভুর প্রতিনিধি। এখন এ ধরনের প্রতিনিধি ও দূতগণই যদি আল্লাহর অনুগত ও আজ্ঞাবহ না হন এবং স্বয়ং তারাই যদি স্বীয় রিসালাতের ব্যতিক্রম কাজ করেন, তবে জনগণ তাদের এহেন আচরণকে কথা ও কাজের অসামঞ্জস্যতা বলে বিবেচনা করবে। ফলে তাদের কথার উপর জনগণের আর কোন প্রয়োজনীয় আস্থা থাকবে না। আর তখন তাদের নবূয়্যত লাভের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে না।

অতএব আল্লাহর প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের দাবি হল এই যে, নবীগণ হবেন পবিত্র ও নিষ্পাপ ব্যক্তিত্ব এবং এমনকি ভূলবশতঃও কোন অযথা কর্ম তাদের ারা সংঘটিত হবে না, যাতে জনগণ ভাবতে না পারে যে, ভুল- ভ্রান্তির অজুহাত তুলে তারা গুনাহে লিপ্ত হতে পারেন।

নবীগণের (.আ) **পবিত্রতার স্বপক্ষে দ্বিতীয় দলিলটি হল** :

নবীগণ ওহীর বিষয়বস্তু ও স্বীয় রিসালাতকে মানুষের নিকট বর্ণনা এবং মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব ছাড়াও মানুষকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, পরিশুদ্ধকরণ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। অন্যকথায়ঃ তারা প্রশিক্ষণ ও পথনির্দেশনার দায়িত্ব ছাড়া ও (আধ্যাত্মিক) প্রশিক্ষণের দায়িত্বেও নিয়োজিত, যা সার্বজনীন এবং যা সমাজের যোগ্যতম ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গকেও সমন্বিত করে। আর এ ধরনের দায়িত্বের অধিকারী কেবলমাত্র তারাই হতে পারেন, যারা মানবীয় উৎকর্ষের চূড়ান্ত স্তরে পৌছেছেন এবং যারা পূর্ণতম আত্মিক দৃঢ়তার (পবিত্রতার দৃঢ়তা) অধিকারী।

তাছাড়া প্রশিক্ষকের আচার- ব্যবহার, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তার বক্তব্য অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি কারও আচরণগত দিক থেকে দুর্বলতা থাকে তবে তার বক্তব্যও আশানুরূপ প্রভাব ফেলে না ।

অতএব কেবলমাত্র তখনই সমাজের প্রশিক্ষক হিসেবে নবীগণকে নবুয়্যত প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে, যখন তারা তাদের কথায় ও কর্মে যে কোন প্রকারের ভূল-   ত্রুটির উর্ধ্বে থাকবেন।

নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে উদ্ধৃতিগত দলিলসমূহ :

১। পবিত্র কোরান মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গকে মোখলাস (مخلص) অর্থাৎ আল্লাহর জন্যে পরিশুদ্ধ হয়েছেন[১১] বলে নামকরণ করেছে যাদেরকে বিপথগামী করার দূরাশা স্বয়ং ইবলিসেরও ছিলনা বা নেই। ইবলিস যখন সকল আদমসন্তানকে বিপথগামী করার সংকল্প করেছিল তখনও মোখলাসিনকে (مخلصين) তার এ সংকল্প বহির্ভূত ধরে নিয়েছিল। যেমনটি পবিত্র কোরানে এসেছে :

(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)

সে (ইবলিস) বলল আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণকে নহে। (সূরা সাদ- ৮২, ৮৩)

নিঃসন্দেহে বিপথগামিতা থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণেই ইবলিস তাদেরকে বিপথগামী করার দুরাশা করেনি; নতুবা তারাও তার শত্রুতার আওতায় রয়েছেন। সুতরাং যদি সম্ভব হত তবে কখনোই তাদেরকে বিপথগামী করা থেকে বিরত হত না।

অতএব মোখলাস (مخلص) অভিধাটি মা'সুমের (معصوم) সমান হবে। যদিও এ গুণটিকে নবীগণের (আ.) জন্যে নির্ধারণ করার কোন দলিল আমাদের কাছে নেই, তবু নিঃসন্দেহে তারাও এ গুণের

অন্তর্ভুক্ত। যেমন : পবিত্র কোরান কিছু সংখ্যক নবীকে মোখলাসিন বলে পরিগণনা করেছে। উদাহরণতঃ উল্লেখযোগ্য যে,

(وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ)

স্মরণ কর আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম এবং তা ছিল পরলোকের স্মরণ । (সূরা সাদ্ - ৪৫, ৪৬)

অনুরূপ,

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا)

স্মরণ কর এই কিতাবে উল্লিখিত মুসার কথা, সে বিশুদ্ধচিত্ত রাসূল ও নবী ছিল। (সূরা মারিয়াম - ৫১)

তদনুরূপ কঠিন সংকটময় মুহূর্তেও হযরত ইউসূফের (আ.) নিশ্চত বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণ হিসেবে তার মোখলাস হওয়াকে দলিল রূপে উল্লেখ করে পবিত্র কোরানে বলা হয় :

(كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ)

তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্যে এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত। (ইউসুফ- ২৪)

২। পবিত্র কোরান নবীগণের (আ.) আনূগত্যকে নিঃশর্তে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছে। উদাহরণতঃ উল্লেখযোগ্য যে,

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ)

শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে। (সূরা নিসা- ৬৪)

আর নিঃশর্তভাবে তাদের আনুগত্য একমাত্র তখনই সঠিক হবে, যখন তারা সম্পূর্ণরূপে প্রভুর অনুগত হবেন এবং তাদের অনুসরণ আল্লাহর আজ্ঞাবহতার বিরোধী হবে না। নতুবা নিঃশর্তভাবে মহান আল্লাহর অনুগত হওয়া, নিঃশর্তভাবে তাদের অনুগত হওয়ার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করবে, যারা ভুল- ভ্রান্তির উর্দ্ধে নন।

৩। পবিত্র কোরান, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদা তাদের জন্যেই নির্ধারণ করেছে যারা জুলমু ারা কলুষিত নন। যেমনঃ স্বীয় সন্তানদের জন্যে ইমামতের মর্যাদা প্রার্থনা করলে ইব্রাহীমকে (আ.) জবাবে বলা হয় :

(قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)

আল্লাহ বললেন আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। (সূরা বাকারা - ১২৪)

এ ছাড়া আমরা জানি যে, প্রতিটি গুনাহের অর্থই হল কমপক্ষে নিজের উপর জুলম করা এবং কোরানের মতে সকল গুনাহগারই 'জালিম' (ظالم) বলে পরিচিত।

অতএব নবীগণ অর্থাৎ মহান আল্লাহ কর্তৃক যারা রিসালাত ও নবুয়্যতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা যে কোন প্রকার গুনাহ ও জুলম থেকে পবিত্র হবেন।

উল্লেখ্য অন্যান্য আয়াত এবং অসংখ্য রেওয়ায়েত থেকেও নবীগণের (আ.) নিষ্পাপত্ব (عصمت) প্রমাণ করা সম্ভব। তবে এখানে আমরা সেগুলোর আলোচনা থেকে বিরত থাকব।

নবীগণের পবিত্রতার গূঢ় রহস্য :

এ পাঠের শেষ অংশে নবীগণের (আ.) পবিত্রতার রহস্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যথোপযুক্ত মনে করছি ।

ওহী লাভের ক্ষেত্রে তাদের পবিত্রতার রহস্য হল, মূলতঃ ওহীর অনুধাবন যা ভুল- ক্রুটি সমন্বিত নয় এবং যিনি তা লাভ করলেন তিনি এমন এক বিশেষ বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী, যা তিনি প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেছেন। একইভাবে ওহী প্রেরণকারীর সাথে ওহীর সম্পর্ককেও (ফেরেস্তা মধ্যস্থতায় থাকুক বা না থাকুক) তিনি উপলব্ধি করে থাকেন। পবিত্র কোরান এ সম্পর্কে বলে :

(مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى)

যা সে দেখেছে তার অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি। (সূরা নাজম - ১১)

এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, ওহীর গ্রাহক ি ধাগ্রস্ত থাকবেন যে, ওহী পেলেন কি- না? অথবা কে তাকে ওহী করেছেন ? কিংবা তার বিষয়বস্তু কী ? যদিও কোন কোন কাল্পনিক গল্পে এসেও থাকে যে, কোন নবী তার নবুয়্যতের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হয়েছে কিংবা ওহীর বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করেননি অথবা ওহী প্রেরণকারীকে চিনতে পারেননি, তবে তা চরম মিথ্যাবাদিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ ধরনের মিথ্যাচার তো সে কথার মত যে, কেউ স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে অথবা বিবেক সম্পন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে সন্দেহ করে !

যা হোক প্রভুর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে (মানুষের নিকট প্রভুর বাণী পৌছে দেয়া) নবীগণের (আ.) পবিত্রতার গূঢ় রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে কিছূটা ভূমিকা দেয়া প্রয়োজন। আর তা হল :

মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডগুলো এভাবে বাস্তবায়িত হয় যে, কোন কাংখিত বিষয়ের প্রতি মানুষের অভ্যন্তরে এক অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন কারণের উপস্থিতিতে এর প্রতি আন্দোলিত হয়। অতঃপর বিভিন্ন জ্ঞান ও উপলব্ধির আলোকে কাংখিত উদ্দেশ্যে পৌছার পথ নির্বাচন করে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মগুলো সম্পাদন করে থাকে। অপরদিকে একাধিক প্রবৃত্তি

ও প্রবণতার সমাবেশ হলে এদের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ টিকে শনাক্তকরণ ও নির্বাচন করার চেষ্টা করে । কি কখনো কখনো জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ফলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর বিষয়ের মূল্যায়ন ও শনাক্তকরণে ব্যর্থ হয়। অথবা উৎকৃষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা বা বদাভ্যাস ও কুপ্রবণতার কারণে কুপ্রবৃত্তিকে নির্বাচন করে থাকে কিংবা সঠিক চিন্তা করার ও উৎকৃষ্টতরটি নির্বাচন করার কোন অবকাশ তার থাকে না।

অতএব মানুষ বাস্তবতাকে যত ভালভাবে চিনবে, ঐগুলো সম্পর্কে যতবেশী জ্ঞাত হবে কিংবা যতবেশী গুরুত্ব প্রদান করবে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি ও প্রবণতাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যতটা দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী হবে, সঠিক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ততটা সফল হবে ও ত্রুটি- বিচ্যুতিসমূহ থেকে ততোধিক নিরাপদে থাকবে ।

আর এ কারণেই প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে উৎকর্ষ ও কল্যাণের এমন স্তরে পৌছতে সক্ষম হন যা নিষ্পাপত্বের সীমানার অতি নিকটবর্তী এবং এমনকি কুকর্ম ও গুনাহকে নিজেদের কল্পনায়ও স্থান দেন না। যেমন : কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই বিষাক্ত ও জীবন নাশক ঔষধসমূহ কিংবা নোংরা ও পচা বস্তু খাওয়ার চিন্তা করতে পারেন না ।

এখন মনে করি যে, বাস্তবতাকে চিনার জন্যে কোন ব্যক্তির প্রতিভা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে এবং তিনি আত্মিক পরিশুদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করেছেন। যেমনটি পবিত্র কোরানের ভাষায় (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ) অর্থাৎ নির্ভেজাল যয়তুনের তৈলের মত এমন নির্মল ও দাহ্য, যেন আগুনের সং শ ব্যতীতই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রজ্জলন প্রায় অবস্থা। আর এ ধরনের তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও আত্মিক পরিশুদ্ধির কারণে মহান আল্লাহর আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে থাকেন এবং রূহুল কুদস বা পবিত্র আত্মা কর্তৃক সহায়তা পেয়ে থাকেন। আর এরূপ ব্যক্তিই অবর্ণনীয় গতিতে উৎকর্ষ বা কামালের পথ অতিক্রম করবেন; অর্থাৎ শতাব্দীর পথ এক রাতে অতিক্রম করবেন এবং শৈশবে, এমনকি মার্তৃগর্ভেও অন্য সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবেন। সকল গুনাহ ও পাপাচারের কদর্যতা এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের নিকট এতই সু ষ্ট, যা অন্যের জন্যে বিষপান ও নিকৃষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত খাবার গ্রহণের ক্ষতির মত ষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে

থাকে। আর যেমন করে একজন সাধারণ মানুষ উল্লেখিত কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য নন, তেমনি পবিত্র বান্দাগণের গুনাহ থেকে বিরত থাকাও কোনভাবেই তাদের এখতিয়ারের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না।

৬ষ্ঠ পাঠ

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব :

নবীগণের পবিত্রতা সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমরা সেগুলোর উল্লেখ করতঃ জবাব প্রদান করব :

১। প্রথম ভ্রান্ত ধারণাটি হল এই যে, মহান আল্লাহ যদি নবীগণকে (আ.) পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখেন, যার অপরিহার্য অর্থ হল দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা বিধান। তবে এ অবস্থায় তাদের কোন স্বাধীন বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং দায়িত্ব পালনের জন্যে ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার জন্যে কোন পুরস্কারের উপযুক্ত হতে পারেন না। কারণ যদি মহান আল্লাহ অন্য কোন ব্যক্তিকেও মা'সুমরূপে নির্বাচন করতেন তবে তিনিও তাদের মতই হতেন।

এ বিষয়টির জবাব পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে পাওয়া যায় এবং তা হল এই যে, মা'সুম হওয়ার অর্থ ায়িত্ব পালনে ও গুনাহ থেকে বিরত থাকায় বাধ্য থাকা নয় (যেমনটি পূর্ববর্তী পাঠে সু ষ্ট হয়েছে)। অনুরূপ মা'সুমগণের (আ.) জন্যে মহান আল্লাহকে রক্ষাকারী বলে জানার অর্থ, তাদের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মের দলিলকে অস্বীকার করা নয়। কারণ যদিও সব কিছুই পরিশেষে প্রভুর সুনির্ধারিত ইরাদার সাথে সম্পর্কিত হয় (যেমনটি একত্ববাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে) এবং যেখানে কোন কর্ম সম্পাদনে প্রভুর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণা থাকবে সেখানে উক্ত কর্মের সাথে তার সম্পর্ক হবে কি প্রভুর ইরাদা মানুষের ইরাদার উল্লম্বে অবস্থান করে অনুভূমে নয় কিংবা পর রের প্রতিস্থাপক রূপেও নয়।

কি মা'সুমগণের (আ.) প্রতি প্রভুর বিশেষ অনূগ্রহ অন্যান্য কারণ, শর্ত ও উপকরণ, যেগুলো বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্যে সরবরাহ করা হয় সেগুলোর মতই তাদের দায়িত্বকে গুরুতর করে এবং তদনুরূপ তাদের কর্মের পুরস্কার যেরূপ বৃদ্ধি পায় তেমনি বিরোধিতা হেতু শাস্তিও। আর এভাবেই

তাদের পুরস্কার ও শাস্তির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও স্বীয় এখিতয়ারের স ্যবহারের কারণে কখনোই তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন না। এ ধরনের ভারসাম্যের দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যারা বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত, তাদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যেমন : মহানবীর (সা.) পরিবারবর্গ ও আলেমগণের দায়িত্ব শংকাতর ও গুরুতর।[১২] আর তাই তাদের সুকর্মের পুরস্কার যেমন অধিকতর, তেমনি পাপাচারের (লিপ্ত হলে) শাস্তিও।[১৩] এ কারণেই যে কেউ আধ্যাত্মিকভাবে যত উচ্চে আরোহণ করবে তার জন্যে অধঃপতনের আশংকা এবং ভুল- ভ্রান্তির ভয়- ভীতিও ততোধিক।

২। অপর ভ্রান্ত ধারণাটি হল : নবীগণ (আ.) ও অন্যান্য মা'সুমিনের (আ.) দোয়া ও মোনাজাত থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা নিজেদেরকে গুনাহগার মনে করেছেন এবং এ জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর এ ধরনের স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও কিরূপে তাদেরকে মাসুম বলা যাবে ?

এর জবাব এই যে, হযরত মা'সুমিন (আ.) যারা মর্যাদার দিক থেকে উৎকর্ষ ও প্রভুর সান্নিধ্যের অধিকারী এবং নিজেদের অন্য সকলের চেয়ে অধিক দায়িত্বের অধিকারী মনে করতেন। এমনকি তাদের প্রিয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি মনোনিবেশ করাই বেশ বড় রকমের গুনাহ বলে গণনা করতেন এবং এ জন্যেই বিনীত ও ক্ষমাপ্রার্থী হতেন। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, নবীগণের পবিত্রতার অর্থ এ নয় যে, সকল কর্ম যেগুলোকে কোনভাবে গুনাহ নামকরণ করা যায়, সেগুলো থেকে বিরত থাকা। বরং তাদের পবিত্রতার অর্থ হল, অনিবার্য কর্তব্যের বিরোধীতা করা থেকে ও শরীয়ত নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা।

৩। তৃতীয় ভ্রান্ত ধারণাটি হল : কোরানের একটি আয়াতে নবীগণের (আ.) পবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মোখলাসিনের (مخلصين) অন্তর্ভুক্ত এবং শয়তান তাদের কাছে কোন কিছু আশা করে না। অথচ স্বয়ং পবিত্র কোরানেই নবীগণের উপর শয়তানের প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :

(يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ)

হে বনী আদম ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই বিভ্রান্ত না করে –যেভাবে তোমাদের পিতা- মাতাকে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল। (সূরা আ'রাফ - ২৭)

উল্লেখিত আয়াতটিতে শয়তান কর্তৃক হযরত আদম (আ.) ও হাওয়াকে প্রতারিত করার মাধ্যমে বেহেস্ত থেকে বহিষ্কারের কথা বলা হয়েছে । অন্য একটি আয়াতে হযরত আয়্যুবের (আ.) বক্তব্য তুলে ধরা হয়। যথা :

(أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ)

শয়তানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। (সূরা সাদ - ৪১)

অনুরূপ অপর একটি আয়াতে সকল নবীগণের (আ.) জন্যে এক ধরনের শয়তানী আবেশের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ)

আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তাদের যে কেউ যখনই কিছু আকাংখা করেছে তখনই শয়তান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। (সূরা হাজ্জ - ৫২)

এর জবাব এই যে, উক্ত আয়াতগুলোর কোনটিতেই নবীণের (আ.) যে, সকল কর্ম শয়তানের প্ররোচনায় অপরিহার্য দায়িত্বের লংঘন বলে পরিগণিত হতে পারে তার উল্লেখ নেই। তবে সূরা আ'রাফের ২৭ নম্বর আয়াতে নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ভক্ষণের ব্যাপারে শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা হারামভুক্ত কোন নিষেধ ছিল না। বরং শুধুমাত্র আদম (আ.) ও হাওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, ঐ বৃক্ষ থেকে আহার গ্রহণ করা জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়া ও পৃথিবীতে অবরোহণের কারণ হবে। কি শয়তানের প্ররোচনা তাদের এ দিকনির্দেশনামূলক (ارشادی) নিষেধের সীমালংঘনের কারণ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ জগৎ, কর্তব্যের জগৎ ছিল না এবং তখনও কোন শরীয়ত নাযিল হয় নি। অপরদিকে সূরা সাদের ৪১ নম্বর আয়াতে, শয়তানের

মাধ্যমে হযরত আয়্যুবের (আ.) উপর যে কষ্ট ও যন্ত্রনা আপতিত হয়েছিল সে সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে এবং আল্লাহর আদেশ- নিষেধ অমান্য করার ব্যাপারে কোন প্রমাণ উক্ত আয়াতে নেই। আবার সূরা হাজ্জের ৫২ নম্বর আয়াতটি এমন সকল প্রতিবন্ধকতা সংশ্লিষ্ট, যা শয়তান নবীগণের (আ.) কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে এবং মানুষের হিদায়াতের ক্ষেত্রে তাদের আকাংখার পথে সৃষ্টি করে। কি   অবশেষে মহান আল্লাহ তার সকল চক্রান্ত ও প্রবঞ্চনাকে নস্যাত করে সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন ।

৪। চতুর্থ ভূল ধারণাটি হল : সূরা তোহার ১২১ তম আয়াতে হযরত আদম (আ.) এর পাপ সম্পর্কে এবং একই সূরার ১১৫ তম আয়াতে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাহলে এ ধরনের পাপ ও ভ্রান্তি কিরূপে হযরত আদমের (আ.) ইসমাত বা পবিত্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে ? এ ভ্রান্ত ধারণাটির জবাব পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সু   ষ্ট হয়েছে যে, পাপ ও ভ্রান্তি অপরিহার্য কর্তব্যের লংঘন ছিল না।

৫। পঞ্চম ভ্রান্ত ধারণাটি হল এই যে, পবিত্র কোরানে কোন কোন নবীগণের (আ.) মিথ্যা বলা সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে। যেমন : সূরা সাফফাতের ৮৯ তম আয়াতে হযরত ইব্রাহীমের (আ.) বক্তব্য থেকে বলা হয় :

(فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ)

অতঃপর সে বলল, “আমি অসুস্থ”।’

অথচ তিনি অসুস্থ ছিলেন না। অনুরূপ সূরা আম্বিয়ার ৬৩ তম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে :

(قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا)

তিনি বললেন : বরং এদের প্রধানই তো এ কাজটি করেছে।

অথচ স্বয়ং ইব্রাহীমই (আ.) মূর্তিগুলোকে ভেংগেছিলেন, আবার সূরা ইউসুফের ৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে :

(ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ)

অতঃপর এক আহবায়ক চীৎকার করে বলল : ‘হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।

অথচ হযরত ইউসুফের (আ.) ভাইগণ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হননি। এর জবাব এই যে, এ ধরনের বক্তব্য যেগুলো কোন কোন রেওয়ায়েতের মতে তৌরিয়াহ (যার অন্য অর্থ হল, ইরাদা করা) নামকরণ করা হয়ে থাকে, সেগুলো অপেক্ষাকৃত বৃহওর কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্ত হয়েছিল এবং কোন কোন আয়াত অনুসারে বলা যেতে পারে ঐগুলো ঐশী ইলহামের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল, যেমন : হযরত ইউসুফের (আ.)- এর কাহিনীতে বলা হয় :

(كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ)

এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। (সূরা ইউসুফ - ৭৬)

যা হোক এ ধরনের মিথ্যা (তৌরিয়াহ), গুনাহ বা ইসমাত বিরোধী নয়।

৬। ষষ্ঠ ভ্রান্ত ধারণাটি হল : হযরত মুসার (আ.) ঘটনায় এসেছে যে, বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তির সাথে কলহে লিপ্ত কিবতীর এক ব্যক্তিকে হযরত মুসা (আ.) হত্যা করেছিলেন। আর এ কারণেই মিশর থেকে পলায়ন করেছিলেন এবং যখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরাউন ও তার সঙ্গীদেরকে আহবান করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন :

(وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ)

আমার বিরুদ্ধে তো তাদের অভিযোগ আছে; আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে। (সূরা শুয়ারা - ১৪)

অতঃপর উল্লেখিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ফেরাউনের কর্ণগোচর করা হলে, তার জবাবে হযরত মুসা (আ.) বলেন :

(فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ)

আমি তো এটা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ। (সূরা শুয়ারা - ২০)

অতএব এ ঘটনাটি কিরূপে 'নবুয়্যতের ঘোষণার পূর্বেও নবীগণের ইসমাতের' ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে ?

এর উত্তর হল এই যে, প্রথমতঃ কিবতীর ঐ ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না। বরং মুষ্টাঘাতের ফলে দূর্ঘটনাবশতঃ ঘটেছিল। িতীয়তঃ ولهم على ذنب অর্থাৎ "আমার বিরুদ্ধে তো তাদের

অভিযোগ আছে” এ কথাটিতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে যার অর্থ হল ‘তারা আমাকে [মুসা (আ.)] হত্যাকারী ও অপরাধী মনে করে এবং ভয় করি যে, তারা আমাকে প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করবে। তৃতীয়তঃ و انا من الضالين অর্থাৎ ‘যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ’ এ কথাটি হয় ফেরাউন সম্প্রদায়ের সাথে আপোসরফা করার জন্যে বলা হয়েছে যে, ‘ধরা যাক তখন আমি বিপথগামী ছিলাম কি এখন মহান আল্লাহ আমাকে হিদায়াত করেছেন এবং চূড়ান্ত যুক্তি- প্রমাণ সহকারে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন’ অথবা (ضلال) অর্থাৎ বিপথগামী শব্দটি এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে যে, উক্ত কর্মের পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। মুসা (আ.) কর্তৃক আল্লাহর অপরিহার্য আদেশের লংঘনের কোন প্রমাণ নেই।

৭। সপ্তম ভ্রান্ত ধারণাটি হল : সূরা ইউনূসের ৯৪ তম আয়াতে মহানবীকে (সা.) উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে :

(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ)

আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হও তবে তোমার পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর; তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। তুমি কখনো সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।

অনুরূপ সূরা বাকারার- ১৪৭ তম, সূরা আলে ইমরানের- ৬০ তম, সূরা আনআমের- ১১৪ তম, সূরা হুদের- ১৭ তম এবং সূরা সাজদার- ২৩ তম আয়াতেও তাকে সন্দেহ ও ি ধাগ্রস্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব কিরূপে বলা যেতে পারে যে, ওহীর উপলব্ধি সন্দেহাতীত ও ি ধাহীন ?

এর জবাব হলঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে হযরতের (সা.) ি ধাগ্রস্ততার কোন প্রমাণ নেই। বরং এ প্রমাণ বহন করে যে, মহানবীর রিসালাত এবং কোরানর ও এর বিষয়বস্তুর সত্যতায় কোন

িধা ন্দ্বের অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের উক্তির উদ্দেশ্য হল এরূপ যে, ার নাড়লে দেয়াল শুনে।

ایاک اعنی و اسمعی یا جارة

৮। অষ্টম ভ্রান্ত ধারণাটি হল : পবিত্র কোরানে নবী (সা.)- এর এমন কিছু গুনাহ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ ক্ষমা করেছিলেন। যেমন : বলা হয়েছে যে,

(لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। (সূরা ফাতহ- ২)

জবাব এই যে, এ আয়াতে উল্লেখিত (ذَنْبِ) অপরাধের অর্থ হল এমন সকল গুনাহ যা মোশরেকরা মহানবীর (সা.) উপর হিজরতের পূর্বে ও পরে আরোপ করেছিল। যেমনঃ তাদের দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করা ইত্যাদি। আর ক্ষমা করার অর্থ হল ঐ সকল কর্মের সম্ভাব্য কুপ্রভাব থেকে রক্ষাকরণ এবং এর প্রমাণ হল এই যে, মক্কা বিজয়কে ঐগুলোর (মোশরেক কর্তৃক আরোপিত অপরাধ) ক্ষমা হিসেবে গণ্য করে বলা হয়েছে :

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)

নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সু   ষ্ট বিজয়। (সূরা ফাতহ - ১)

আর নিঃসন্দেহে যদি ঐ সকল গুনাহের অর্থ প্রকৃতই গুনাহ হত তবে সে সকল গুনাহের ক্ষমার জন্যে কোনভাবেই মক্কা বিজয়কে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হত না ।

৯। নবম ভ্রান্ত ধারণাটি হল : পবিত্র কোরান হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক তার পালকপুত্র যাইদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বলে :

(وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ)

তুমি লোকনিন্দার ভয় করছিলে অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত ছিল। (সূরা আহযাব- ৩৭)

অতএব কিরূপে এ ধরনের ব্যাখ্যা ইসমাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে ?

জবাব হল : নবী (সা.) এ ভয়ে ভীত ছিলেন যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে অন্ধকার যুগের একটি কুপ্রথার (পালক পুত্রকে, সত্যিকার পুত্রের সমান মনে করা) অপসারণের চেষ্টা করলে, জনগণ ইমানের দুর্বলতার কারণে একে নবীর (সা.) ব্যক্তিগত চাহিদা বলে মনে করবে যা ীনের ব্যাপারে তাদের িধা ন্দ্বের কারণ হতে পারে। মহান আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে অবহিত করেন যে, এ কুপ্রথার উচ্ছেদ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে নবী (সা.) এর কার্যকর সংগ্রামের ক্ষেত্রে তার (আল্লাহর) ইরাদার বিরোধিতা করার ভয় অপেক্ষাকৃত বেশী উপযোগী। অতএব এ আয়াত কোন ভাবেই নবী (সা.) এর তিরস্কার হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

১০। দশম ভ্রান্ত ধারণাটি হল : পবিত্র কোরান কোন কোন ক্ষেত্রে মহানবীকে (সা.) তিরস্কার করেছে। যেমন : যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার ব্যাপারে নবী (সা.) কর্তৃক কোন কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দান প্রসঙ্গে বলা হয় :

(عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ)

আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কেন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদেরকে চিনার আগেই তাদেরকে অনুমতি দিলে? (সূরা তওবাহ –৪৩)

অনুরূপ কোন কোন স্ত্রীকে তুষ্ট করার জন্যে কিছু হালাল বিষয়কে (নিজের জন্য) নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে বলে :

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ)

হে নবী ! আল্লাহ তোমার জন্যে যা কিছু বৈধ করেছেন, তোমার স্ত্রীগণের স ষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কেন তা নিজের জন্য অবৈধ করছো? (সূরা তাহরীম - ১)

তাহলে এ ধরনের তিরস্কার কিরূপে তার ইসমাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে ?

এর জবাব এই যে, এ ধরনের উক্তির অর্থ হল তিরস্কারের আড়ালে প্রশংসা করা। আর এর মাধ্যমে নবী (সা.) এর অপরিসীম উদারতা ও অনুগ্রহের প্রমাণ মিলে যে, মোনাফেক ও কলুষিত দয়ের মানুষকেও তিনি নিরাশ করতেন না এবং তাদের গোপন অপরাধের পর্দা উন্মোচন করতেন না। অনুরূপ স্ত্রীগণের তুষ্টি এ জন্যে ছিল যে, তিনি স্বীয় চাওয়া- পাওয়ার চেয়ে স্ত্রীগণের চাওয়া- পাওয়ার অগ্রাধিকার দিতেন এবং মোবাহ বিষয়কে শপথের মাধ্যমে নিজের জন্যে নিষিদ্ধ করে ছিলেন - এ রূপ নয় যে, (العیذ باللہ) মহান আল্লাহর আদেশকে পরিবর্তন করেছিলেন এবং কোন হালালকে মানুষের জন্যে হারাম করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতগুলো এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সকল আয়াতের মত, যেগুলো কাফেরদের হিদায়াতের ব্যাপারে নবী (সা.) এর অবর্ণনীয় আন্তরিক ইচ্ছার ইংগিত বহন করে। যেমন :

(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)

তারা ঈমান আনছে না এ কারনেই মনে হচ্ছে অতিমনোকষ্টে নিজের জীবনকে বিপন্ন করবে! (সূরা শুয়ারা- ৩)

অথবা ঐ আয়তটি যাতে মহান আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী (সা.) এর অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

(طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى)

তা’হা, তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্যে আমি তোমার নিকট কোরান অবতীর্ণ করিনি। (সূরা তোহা- ১- ২)

অতএব তা মহানবী (সা.) এর ইসমাতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

৭ম পাঠ

মু'জিযাহ

নবুয়্যতকে প্রমাণের উপায়সমূহ :

নবুয়্যত অধ্যায়ের তৃতীয় মূল আলোচ্য বিষয়টি হল এই যে, সত্য নবীগণের দাবির সত্যতাকে এবং মিথ্যা নবীদের দাবির অসারতাকে কিরূপ অন্যদের জন্যে প্রমাণ করা যেতে পারে ?

নিঃসন্দেহে যদি এমন কোন দুষ্কৃতিকারী ও গুনাহে কলুষিত ব্যক্তি নবূয়্যতের দাবি করে, যার কুপ্রবনতার কুৎসিত দিকগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তি অনুধাবন করতে পারে, তবে এমন কোন ব্যক্তির দাবির কোন বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যতা থাকবে না এবং নবীগণের জন্যে বর্ণিত ইসমাতের শর্তের আলোকে তার এ দাবির অসারতা প্রমাণ করা সম্ভব - বিশেষ করে যদি এমন কোন বিষয়ের দিকে আহবান করে, যা বুদ্ধিবৃত্তি ও ফিতরাত বিরোধী হয় অথবা যদি তার বক্তব্য স্ববিরোধী হয়।

অপরদিকে কোন ব্যক্তির এমন সুখ্যাতিপূর্ণ অতীত বিদ্যমান যে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা তার দাবির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে - বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তি যদি তার আহবানকৃত বিষয়ের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। অনুরূপ, অন্য কোন নবীর ভবিষ্য াণী ও পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যমেও কোন ব্যক্তির নবুয়্যতকে এরূপে প্রমাণ করা সম্ভব, যার ফলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের জন্যে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

কি যদি কোন সম্প্রদায়ের নিকট কারও নবুয়্যতের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিশ্বাসযোগ্য কোন সূত্র না থাকে অথবা অপর কোন নবী কর্তৃক ঐ ব্যক্তির নবুয়্যতের সুসংবাদ ও অনুমোদন প্রাপ্তির সংবাদ ঐ জনগোষ্ঠীর নিকট যদি না পৌছে থাকে তবে তার নবুয়্যতের প্রমানের জন্য অন্য কোন উপায়ের প্রয়োজনীয়তা থাকাটা স্বাভাবিক । আর তাই মহান আল্লাহ তার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার আলোকে এ পথটি উন্মুক্ত করেছেন এবং নবীগণকে এমন কিছু মু'জিযাহ দান করেছেন, যেগুলো

তাদের দাবির সত্যতাকে নির্দেশ করে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ঐগুলোকে আয়াত (ایات)[১৪] বা নিদর্শনসমূহ নামকরণ করা হয়েছে।

অতএব সত্য নবীগণের (আ.) দাবির সত্যতাকে তিনভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। যথা :

১। বিশ্বাসযোগ্য সূত্রসমূহ থেকে, যেমন : আজীবন সত্যবাদীতা ও সঠিক পথে থাকা সত্যপথ থেকে অবিচ্যুত থাকা ও ন্যায়পরায়ণ থাকা। তবে এ উপায়টি ঐ সকল নবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা বর্ষ পরম্পরায় জনগণের মাঝে জীবন- যাপন করেছেন এবং যারা সংশ্লিষ্ট সমাজে চারিত্রিক দিক থেকে সুপরিচিত। কি যদি কোন নবী শৈশবে বা যৌবনে এবং জনগণ কর্তৃক তার ব্যক্তিত্ব ও সুনির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত হওয়ার পূর্বেই রিসালাতের অধিকারী হন তবে উল্লেখিত পদ্ধতিতে তার দাবির সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

২। পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন নবী কর্তৃক পরিচয় উপস্থাপনার মাধ্যমে : এ পদ্ধতিও ঐ জনসমষ্টির জন্যেই প্রযোজ্য যারা অন্য কোন নবীকে শনাক্ত করতে পেরেছেন এবং তার প্রদত্ত সুসংবাদ ও অনুমোদন সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছেন। স্বভাবতঃই এ পথটি পূর্ববর্তী নবীর জন্যেও প্রযোজ্য নয়।

৩। মু'জিযাহ প্রদর্শনের মাধ্যমে যা বিস্তৃত ও সার্বজনীনভাবে কার্যকরী। ফলে আমরা এ পদ্ধতিটির আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

মু'জিযাহর সংজ্ঞা :

মু'জিযাহ বলতে বুঝায় - অলৌকিক কোন বিষয়কে, যা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবুয়্যতের দাবিদার কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় এবং যা তার দাবির সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ।

লক্ষ্যণীয় যে, এ সংজ্ঞাটিতে তিনটি বিষয় সন্নিহিত আছে। যথা :

ক) এমন কিছু অলৌকিক বিষয়ের অস্তিত্ব রয়েছে যেগুলো সাধারণ ও জ্ঞাত কোন কারণের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে না।

খ) এ অলৌকিক বিষয়সমূহের মধ্যে কতিপয় আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে নবীগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

গ) এ ধরনের অলৌকিক বিষয়সমূহই কেবল নবীগণের দাবির সত্যাতার নিদর্শন হতে পারে। আর তখন এগুলোকে পরিভাষাগত অর্থে মু'জিযাহ (معجزه) নামকরণ করা হয়ে থাকে।

এখন আমরা উপরোক্ত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ত্রয় সম্পর্কে আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

অলৌকিক বিষয়সমূহ :

এ বিশ্বে যে সকল বিষয় সংঘটিত হয়, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই এমন সকল কারণের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে যেগুলোকে বিভিন্ন পরীক্ষাগারে শনাক্তকরণ সম্ভব। যেমন : পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যার অন্তর্ভূক্ত অধিকাংশ বিষয়। কি বিরল ক্ষেত্রসমূহে এ অলৌকিক বিষয়সমূহের কিছু কিছু অন্য কোনভাবে সংঘটিত হয় এবং ঐগুলোর সঠিক কারণসমূহকে ঐন্দ্রিয় পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ করা যায় না। কারণ এ ধরনের বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে অন্য এক শ্রেণীর নির্বাহক কার্যকর। যেমন : যোগীদের বিভিন্ন বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড ইাত্যাদি। বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, এ সকল কর্মকাণ্ড বস্তুগত ও অভিজ্ঞতালব্ধ নিয়মের ভিত্তিতে সংঘটিত হয় না। আর এ ধরনের বিষয়সমূহই অলৌকিক বিষয় (خارق العادة) নামে পরিচিত।

প্রভু কর্তৃক সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা :

অলৌকিক ঘটনাসমূহকে সার্বিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি হল ঐ সকল ঘটনা যাদের কারণসমূহ সাধারণ না হলেও ঐ সকল অসাধারণ কারণসমূহ মোটামুটি মানুষের আওতাধীন এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে ঐ গুলোকে অর্জন করা সম্ভব। যেমন : যোগীদের কর্মকাণ্ড। আর অপরটি হল ঐ সকল অলৌকিক ঘটনা যেগুলোর বাস্তবায়ন প্রভুর

বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুমতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ঐ গুলোর অধিকার মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হয় না। অতএব উপরোক্ত িতীয় শ্রেণীর অলৌকিক ঘটনাসমূহের দু'টি মৌলিক বিশেষত্ব বিদ্যমান। যথা :

প্রথমতঃ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণযোগ্য নয় এবং িতীয়তঃ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শক্তির ারা প্রভাবিত হয় না ও অন্য কোন নির্বাহকের নিকট পরাভূত হয় না ।

আর এ ধরনের অলৌকিক বিষয়সমূহ একমাত্র আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গেরই অধীন এবং কখনোই বিপথগামী ও কলুষিতদের নাগালে আসে না। কি শুধুমাত্র নবীগণের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। বরং কখনো কখনো আল্লাহর অন্যান্য ওলীগণও এগুলোর অধিকারী হতে পারেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কালামশাস্ত্রের পরিভাষায় বর্ণিত (িতীয় শ্রেণীর) সকল অলৌকিক ঘটনাকে মু'জিযাহ বলা হয় না এবং এ ধরনের যে সকল কর্মকাণ্ড নবীগণ ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে সংঘটিত হয় সেগুলোকে সাধারণত কেরামত নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন : প্রভু প্রদত্ত অসাধারণ জ্ঞান শুধুমাত্র নবুয়্যতের ওহী সংশ্লিষ্ট নয় এবং যখন এ ধরনের জ্ঞান (নবী ভিন্ন) অন্য কাউকে প্রদত্ত হয়, তখন এলহাম (الهام), তাহিদস (تحديث) ইত্যাদি নামকরণ করা হয়।

যা হোক এ দু'ধরনের (ঐশ্বরিক ও অনৈশ্বরিক) অলৌকিক ঘটনাসমূহকে শনাক্তকরণের উপায় জ্ঞাত হল অর্থাৎ যে সকল অলৌকিক ঘটনা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণযোগ্য অথবা যদি অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে ঐগুলোর সংঘটন ও অগ্রগতিকে রোধ করা যায় এবং ঐগুলোর প্রভাব নস্যাৎ করা যায় তবে ঐগুলো প্রভু কর্তৃক সংঘটিত অলৌকিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন : কোন ব্যক্তির দুস্কৃতি ও অন্যায় বিশ্বাস ও চরিত্রকে মহান আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কহীনতার এবং তার কর্মগুলো শয়তানী ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নিদর্শনরূপে গণনা করা যেতে পারে।

এখানে অন্য একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করছি। আর তা হল এই যে, ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনাসমূহের কর্তা হিসেবে মহান আল্লাহকে মনে করা যেতে পারে (সকল সৃষ্ট বিষয় যেমন : সাধারণ ঘটনাসমূহের কর্তৃত্ব ব্যতীতও) - এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ঐ গুলোর সংঘটন তার বিশেষ অনুমতির সাথে সম্পর্কিত।[১৫] অনুরূপ ঐগুলোর মাধ্যম হিসেবে উদাহরণতঃ

ফেরাস্তাগণ অথবা নবীগণের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা যেতে পারে। আর তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তারা মাধ্যম হিসাবে বা নিকটবর্তী কর্তা হিসেবে ভূমিকা রাখেন। যেমন করে পবিত্র কোরান মৃতদেরকে জীবিতকরণ, অসুস্থকে আরোগ্যদান এবং পাখী সৃষ্টিকে ঈসার (আ.) কর্তৃত্ব বলে উল্লেখ করেছে।[১৬] সুতরাং এ দু'ধরনের কর্তৃত্বের উদ্ধৃতি দেয়ার মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। কারণ প্রভুর কর্তৃত্ব বান্দাদের কর্তৃত্বের উল্লম্বে অবস্থান করে।

নবীগণের মু'জিযাহর বৈশিষ্ট্য :

মু'জিযাহর সংজ্ঞায় তৃতীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে তা এই যে, মু'জিযাহ নবীগণের দাবির সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, যখন অলৌকিক বিষয়সমূহকে কালামশাস্ত্রের পরিভষায় মু'জিয়াহ নামকরণ করা হয় যখন প্রভুর বিশেষ অনুমতির প্রমাণ ছাড়াও নবীগণের নবুয়্যতের দলিলস্বরূপ সংঘটিত হয়। আর এর ভাবার্থের কিছুটা সম্প্রসারণ করলে, ঐ সকল অলৌকিক বিষয়কেও সমন্বিত করে, যা ইমামতের দাবির সত্যতার প্রমাণ হিসেবে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর এভাবে কেরামত (کرامت) পরিভাষাটি অন্যান্য ঐশ্বরিক অলৌকিক বিষয়সমূহ, যেগুলো আল্লাহর ওলীগণের মাধ্যমে, যাদুকর ভাগ্যগণক ও যোগীদের বিভিন্ন কর্মের মত শয়তানী ও কুমন্ত্রণাপ্রসূত অলৌকিক বিষয়সমূহের প্রতিকুলে সংঘটিত হয়। এ ধরনের (শয়তানী) কর্মগুলো একদিকে যেমন শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণযোগ্য, অপরদিকে তেমনি বৃহত্তর শক্তির নিকট পরাভূত হয় এবং সাধারণতঃ ঐগুলোর অনৈশ্বরিকতার প্রমাণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও আচরণে প্রতিফলিত হয়।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, নবীগণের (আ.) মু'জিযাহসমূহ যা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে তা হল তাদের নবুয়্যতের দাবির সত্যতা। কি রিসালাতের বিষয়বস্তুর সঠিকতা এবং আদিষ্ট বিষয়সমূহের আনুগত্যের অপরিহার্যতা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় : নবীগণের নবুয়্যতকে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে এবং তাদের সংবাদের বিষয়বস্তুর বিশ্বস্ততা বিশ্বাসগত (تعبدی) দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।[১৭]

৮ম পাঠ

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব :

মু' জিযাহ সম্পর্কে একাধিক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। এখন আমরা ঐগুলোর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করব।

১। প্রথম ভ্রান্ত ধারণাটি হল : সকল বস্তুগত বিষয়ের জন্যেই বিশেষ কারণ বিদ্যমান, যাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা সম্ভব। পরীক্ষাগারের প্রচলিত সরঞ্জামের মাধ্যমে পরীক্ষার অনুপযোগী বিষয়সমূহের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা, কোন বিষয়ের জন্যে সাধারণ কারণের অনুপস্থিতির দলিল নয়। অতএব অলৌকিক বিষয়সমূহ শুধুমাত্র এ হিসেবেই গ্রহণযোগ্য হবে যে, এ গুলো অজ্ঞাত কোন কারণ ও নির্বাহকের প্রভাবে অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। সর্বোপরি যতক্ষণ পর্যন্ত এ অলৌকিক বিষয়সমূহের কারণ অজ্ঞাত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ গুলোকে মু'জিযাহরূপে গণনা করা যেতে পারে। কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকরণযোগ্য কারণকে অস্বীকার করার অর্থ হল কার্যকারণ বিধির ব্যতিক্রম, যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

জবাব : কার্যকারণ বিধির আবেদন এর চেয়ে অধিক নয় যে, সকল নির্ভরশীল অস্তিত্বের জন্যই কোন না কোন কারণ বিদ্যমান। কি সকল কারণই যে, জ্ঞাত হবে তা কখনোই কার্যকারণ বিধির জন্যে অপরিহার্য নয় এবং এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি পাওয়া যাবে না। কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষার পরিধি প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং অতিপ্রাকৃতিক বিষয়সমূহের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অথবা তাদের প্রভাবকে কখনোই পরীক্ষাগারে ব্যব ত সরঞ্জামের মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে না।

কি অজ্ঞাত কারণের জ্ঞানরূপে মু'জিযাহর যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ যদি এ জ্ঞান সাধারণ কারণের মতই লব্ধ হয় তবে অন্যান্য সাধারণ ঘটনার সাথে এর কোন পার্থক্য থাকবে না এবং কখনোই একে অলৌকিক ঘটনা হিসেবে গণনা করা যাবে না। আবার যদি উল্লেখিত জ্ঞান অসাধারণ পথে অর্জিত হয় তবে তা অলৌকিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যখন মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবুয়্যতের সাক্ষীরূপে সংঘটিত হবে তখন তা এক প্রকার মু'জিযাহরূপে পরিগণিত হবে। যেমন : মানুষের সঞ্চয় ও খাদ্য সম্পর্কে হযরত ঈসার (আ.) জ্ঞান, তার একটি মুজিযাহরূপে পরিগণিত হয়েছে। পবিত্র কোরানের আয়াত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

(وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ)

আর যা কিছু আহার কর এবং নিজেদের গৃহে মওজুদ কর তা তোমাদেরকে বলে দিব। (সূরা আলে ইমরান - ৪৯)

কি মু'জিযাহর অন্যান্য প্রকরণকে অস্বীকার করে একে শুধুমাত্র উল্লেখিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা যাবে না। কারণ তখনও এ প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায় যে, এ কার্যকারণ বিধির দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টির সাথে অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার কী পার্থক্য বিদ্যমান?

২। িতীয় ভ্রান্ত ধারণা : আল্লাহর নিয়ম এরূপ যে, সকল কিছুকেই স্বতন্ত্র কারণের মাধ্যমে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। আর কোরানের পবিত্র আয়াত অনুসারে আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন হয় না।[১৮] অতএব অলৌকিক ঘটনাসমূহ যে, আল্লাহর নিয়মে পরিবর্তন করে তা এ ধরনের আয়াতের মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়।

এ ভ্রান্ত ধারণাটি পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণাটির মতই। তবে এতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান যে, পূর্বোক্তটিতে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছিল কি এখানে কোরানের আয়াতের মাধ্যমে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে । যা হোক এর উত্তর হল : কারণ ও উপকরণসমূহকে কেবলমাত্র সাধারণ উপকরণ ও কারণসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ আল্লাহর অপরিবর্তনশীল নিয়মের অন্তর্ভুক্ত

বলে গণনা করা অযৌক্তিক। নতুবা তা ঐ ব্যক্তির দাবির মত হবে যে মনে করে ‘তাপের একমাত্র কারণ হল আগুন ’ আর এটি হল আল্লাহর অপরিবর্তনশীল নিয়মের অন্তর্ভূক্ত আর এ ধরনের দাবির প্রতিকূলে বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন প্রকারের কার্যের জন্যে একাধিক প্রকারের কারণের উপস্থিতি এবং সাধারণ কারণকে, অসাধারণ কারণের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন, সর্বদা এ বিশ্বে বিদ্যমান। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে একে আল্লাহর নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা উচিৎ এবং কারণসমূহকে শুধু সাধারণ কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধকরণই হল আল্লাহর নিয়মের পরিবর্তন, যা পবিত্র কোরানের উল্লেখিত আয়াতসমূহে অস্বীকার করা হয়েছে।

যাহোক, আল্লাহর নিয়মের অপরিবর্তনশীলতার প্রমাণ বহনকারী আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করা, যেখানে সাধারণ কারণের প্রতিস্থাপনহীনতা আল্লাহর অপরিবর্তনশীল নিয়মসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়, তা অযৌক্তিক চিন্তা বৈ কিছু নয়। তদুপরি মুজিযাহ ও অলৌকিক ঘটনার প্রমাণবহ অসংখ্য আয়াত উপরোক্ত ব্যাখ্যার অসারতার সু   ষ্ট দলিল। উল্লেখিত আয়াতসমূহের সঠিক ব্যাখ্যার জন্যে তাফসিরগ্রন্থসমূহে অনুসসন্ধান করতে হবে।

এখানে আমরা সংক্ষেপে বলব যে, এ শ্রেণীর আয়াতসমূহ কারণের একাধিক্যের ও সাধারণ কারণের আসাধারণ কারণ কর্তৃক প্রতিস্থাপনের বিরোধী নয়। বরং কার্যের কারণহীনতার বিরোধী। সর্বোপরি সম্ভবত এটুকু বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, উল্লেখিত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুর নিশ্চিত পরিমাণ (القدر المتيقين)[১৯] অসাধারণ কারণসমূহের প্রভাবকে স্বীকার করে।

৩। তৃতীয় ভ্রান্ত ধারণা : পবিত্র কোরানে এসেছে যে, মানুষ উত্তর উত্তর ইসলামের নবীর (সা.) নিকট মু’জিযাহ ও অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শণের জন্যে আবেদন করত। কি   হয়রত (সা.) এ ধরনের আবেদনের জবাব প্রদানে বিরত থাকতেন।[২০] যদি মু’জিযাহ প্রদর্শন নবুয়্যতের প্রমাণের জন্যে একটি উপায় হয়ে থাকে তবে কেন নবী (সা.) এ উপায়টি ব্যবহার করেন নি ?

জবাব : এ ধরনের আয়াতসমূহ ঐ সকল আবেদন সংশ্লিষ্ট, যা সত্য প্রকাশ করার ও প্রাগুক্ত তিনটি পথের প্রতিটি পথেই নবুয়্যাত প্রতিপাদিত হওয়ার পর আক্রোশ ও শত্রুতাবশতঃ অথবা

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে করেছিল, সত্যানুসন্ধিৎসা বশতঃ নয়।[২১] আর এ ধরনের আবেদনে সাড়া দেয়া প্রভুর প্রজ্ঞা সঙ্গত নয়।

আর এর ব্যাখ্যা এরূপ : মু'জিযাহ এ বিশ্বে বিদ্যমান বিন্যাস ব্যবস্থার একটি ব্যতিক্রমী বিষয় যা কখনো কখনো মানুষের আবেদনের জবাবস্বরূপ [যেমন : হযরত সালেহর (আ.) উটনী] আবার কখনো বা প্রারম্ভিকভাবেই [যেমন : ঈসার (আ.) মু'জিযাহ] সংঘটিত হত। আর এ মু'জিযাহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নবীগণকে (আ.) পরিচিতকরণ এবং তাদের নবুয়্যতের দাবির স্বপক্ষে চূড়ান্ত যুক্তি- প্রমাণ পেশ করণ - নবীগণের (আ.) আহবানে সাড়া দেয়ার জন্যে বাধ্য করতে ও জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করতে নয় অথবা চিত্তবিনোদনের উপকরণ সরবরাহ ও সাধারণ কারণ ও কারণত্বের বিন্যাস ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করার জন্যে নয়। আর এ ধরনের উদ্দেশ্য সকল আবেদনেরই ইতিবাচক জবাব দেয়ার অবকাশ দেয় না। বরং এদের কোন কোনটির পক্ষে সাড়া দেয়া প্রজ্ঞাবিরোধী ও অনর্থক বৈ কিছু নয়। যেমন : যে সকল আবেদন স্বাধীনভাবে নির্বাচনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ও জনগণকে নবীগণের (আ.) অহবানে সাড়া দেয়ার জন্য বল প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল অথবা সত্যানুসন্ধিৎসা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ও শত্রুতাবশতঃ করা হত। কারণ যদি ঐ সকল আবেদনে সাড়া দেয়া হত তবে একদিকে মু'জিযাহ প্রদর্শন বেলেল্লাপনায় পর্যবসিত হত এবং মানুষ শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনের বিষয় হিসাবেই এটাকে গ্রহণ করত অথবা ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে নবীগণের পাশে জোটবদ্ধ হত। অপর দিকে পরীক্ষা ও স্বাধীন নির্বাচনের দ্বার বন্ধ হত এবং মানুষ অস ষ্টচিত্তে বাধ্য হয়ে নবীগণের (আ.) আনুগত্য স্বীকার করত। আর উল্লেখিত উভয় প্রক্রিয়াই প্রজ্ঞা ও মু'জিযাহ প্রদর্শনের পরিপন্থী ছিল।

বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত প্রভুর প্রজ্ঞাপন্থী অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই মানুষের আবেদন গ্রহণ করা হত। যেমন : ইসলামের নবী (সা.) এর মাধ্যমেও অসংখ্য মু'জিযাহ প্রদর্শিত হয়েছিল, যেগুলোর অধিকাংশ বহুবর্ণিত উদ্ধৃতির (হাদীসে মুতাওয়াতির) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ গুলোর শীর্ষে রয়েছে চিরন্তন মু'জিযাহ পবিত্র কোরান, যার আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

৪। চতুর্থ ভ্রান্ত ধারণা : মু'জিযাহ যে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভুর বিশেষ অনুমতির সাথে সম্পর্কিত সে দৃষ্টিকোণ থেকে তা মহান আল্লাহর সাথে মু'জিযাহ প্রদর্শনকারীর বিশেষ সম্পর্কের নিদর্শনরূপে গণনা করা যেতে পারে। আর তা এ যুক্তিতে যে, তাকে বিশেষ অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্যকথায় : মহান আল্লাহ স্বীয় কীর্তিকে তারই (মু'জিযাহ প্রদর্শনকারী) ইরাদার প্রবাহ ধারায়, তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছেন। কি এ ধরনের শর্তের বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল এটা নয় যে, ওহীর প্রেরণ ও গ্রহণের মত অপর একটি সম্পর্ক মহান আল্লাহ ও মু'জিযাহ প্রদর্শনকারীর মধ্যে বিদ্যমান। অতএব মু'জিযাহকে নবুয়্যতের দাবির সত্যতার জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলরূপে গণ্য করা যায় না এবং সর্বোচ্চ হলেও একে সম্ভাব্য ও ইক্বনায়ী (اقناعی) (পরিতৃপ্তকারী) দলিল হিসেবে গণনা করা যেতে পারে।

জবাব : অলৌকিক কর্মকাণ্ডগুলো (ঐশ্বরিক অলৌকিক বিষয় হলেও) স্বয়ংক্রিয় পন্থায় ওহীর সম্পর্কের জন্যে কোন দলিল নয়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আল্লাহর ওলীগণের কেরামতকেও তাদের নবুয়্যতের দলিলরূপে গণ্য করা যায় না। কি বিবেচনার বিষয় হল তার ক্ষেত্রেই যিনি নবূয়্যতের দাবি করেছেন এবং এর প্রমাণ স্বরূপ মু'জিযাহ প্রদর্শন করেছেন। মনে করুন, যদি এ ধরনের কেউ মিথ্যার বশবর্তী হয়ে নবূয়্যত দাবী করত (অর্থাৎ সে বিভৎস ও কদর্যপূর্ণ গুনাহে লিপ্ত হল, যা ইহ ও পরকালে কুৎসিততম অনাচার বলে পরিচিত)[২২] তবে কখনোই সে মহান আল্লাহর সাথে এ ধরনের সম্পর্কের। যোগ্যতাসম্পন্ন হত না এবং প্রভুর প্রজ্ঞা কখনোই মু'জিযাহ প্রদর্শনের ক্ষমতা তাকে প্রদান সঙ্গত মনে করত না, যার মাধ্যমে সে মানুষকে বিপথগামী করত।

সিদ্ধান্ত : বুদ্ধিবৃত্তি ষ্টতঃই অনুধাবন করতে পারে যে, যদি কেউ মহান আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের ও মু'জিযাহ প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে তবে কখনোই স্বীয় প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না অথবা তার বান্দাদের বিপথগামিতা ও অনন্ত দুর্দশার কারণ হতে পারে না।

অতএব মু'জিযাহ প্রদর্শন হল নবূয়্যতের দাবির সত্যতার জন্যে চূড়ান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল।

৯ম পাঠ

নবীগণের বিশেষত্বসমূহ

নবীগণের সংখ্যাধিক্য :

এ পর্যন্ত পথপরিচিতি ও নবুয়্যতের তিনটি মূলবস্তু আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল। ইতিমধ্যে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, ইহ ও পরকালীন সৌভাগ্যের জন্যে যে সকল জ্ঞাতব্য মানুষের জন্যে অপরিহার্য সে গুলোর সবগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে অসম্ভব সেহেতু প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল - নবী অথবা নবীগণকে নির্বাচন করতঃ প্রয়োজনীয় সকল বাস্তবতা সম্পর্কে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিবেন যাতে অবিচ্যুত ও সঠিক অবস্থায় ঐ বিষয়গুলোকে অন্য সকল মানুষের নিকট পৌছাতে পারেন। অপরদিকে এ মনোনীত ব্যক্তিগণকে এরূপে মানুষের নিকট পরিচয় করাবেন, যাতে তাদের স্বপক্ষে চূড়ান্ত দলিল উপস্থাপিত হয় এবং এর সার্বজনীন পন্থা হল, মু'জিযাহ প্রদর্শন।

উপরোক্ত বিষয়কে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি। কি উল্লেখিত দলিলটিতে নবীগণের সংখ্যাধিক্য, কিতাবসমূহ ও ঐশী বিধানসমূহের কোন প্রমাণ উপস্থাপিত হয়নি। ধরা যাক, যদি মানুষের জীবন এরূপ হত যে, একজন নবী বিশ্বের শেষাবধি এমনভাবে সকল মানব সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারতেন যে, সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় একই নবীর বাণীর মাধ্যমে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারত, তবে তা অযৌক্তিক হত না।

কি আমরা জানি যে, প্রথমতঃ প্রতিটি মানুষেরই (নবীগণেরও) আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ। আর প্রভুর প্রজ্ঞার দাবিও এটা ছিলনা যে, সর্বপ্রথম নবীই পৃথিবীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত জীবন- যাপন করবেন এবং সকল মানুষকেই ব্যক্তিগতভাবে পথনির্দেশ দিবেন।

িতীয়তঃ জীবনের শর্ত বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একরকম নয় এবং জীবনের এ বৈচিত্রময়তা ও শর্তের পরিবর্তন এবং বিশেষ করে সামাজিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, বিধি-বিধান ও সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যদি এ বিধিগুলো এমন কোন নবীর মাধ্যমে বর্ণিত হত যিনি সহস্র শতাব্দী পূর্বে নবুয়্যত লাভ করেছিলেন তবে তা অনর্থক কর্ম হত। এ ছাড়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐগুলোর রক্ষণ ও প্রচার খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ।

তৃতীয়তঃ পূর্ববর্তী অধিকাংশ সময়ই নবীগণের প্রচার সামগ্রী এ রকম ছিলনা যে, একজন নবী স্বীয় বাণীগুলো সকল বিশ্ববাসীর নিকট পৌছাতে সক্ষম হতেন।

চতুর্থতঃ কোন জনসমষ্টিতে প্রেরিত এক নবীর বাণীসমূহ সময়ের আবর্তে বিভিন্ন কারণের প্রভাবে, ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও বিকৃতির সম্মুখীন হত এবং কালক্রমে একটি বিকৃত ধর্মে রূপ পরিগ্রহ করত। যেমন : ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর তাওহীদি ধর্ম বা একত্ববাদী ধর্ম সময়ের পরিক্রমায় তৃতবাদী ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এ বিষয়টির আলোকে নবীগণের (আ.) এবং মানুষ ও সমাজের কোন কোন বিধি-নিয়মের সংখ্যাধিক্যের রহস্য উন্মোচিত হয়[২৩] - যদিও ঐ গুলোর সবগুলোই মৌলিক বিশ্বাস, চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সামগ্রিক নীতিমালার ক্ষেত্রে পর র সম্পর্কযুক্ত।[২৪] যেমন : সকল ঐশী ধর্মেই নামাজ ছিল - যদিও তা সম্পাদনের প্রক্রিয়া ও কিবলাহ বিভিন্ন ছিল। অনুরূপ পরিমাণ ও ক্ষেত্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যাকাত সম্প্রদান ব্যবস্থাও সর্বদাই ছিল।

যা হোক সকল নবীগণের (আ.) উপর বিশ্বাস স্থাপন, নবুয়্যতের স্বীকৃতির দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য না করা তাদের সকল বাণী ও সকল জ্ঞাতব্য, যা কিছু তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে সেগুলোকে গ্রহণ করা এবং তাদের মধ্যে বৈষম্য না করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য।[২৫] অনুরূপ কোন নবী এবং তার কোন শরীয়ত ও আহকামকেই অস্বীকার করা বৈধ নয়। এমনকি তাদের যে কোন একজনকে অস্বীকার করা সকলকে অস্বীকার করার সমতুল্য; যেমন : প্রভুর কোন একটি আদেশকে অস্বীকার করা সকল আদেশের অস্বীকৃতির সমান।[২৬] তবে প্রত্যেক

উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংশ্লিষ্ট নবী ও তার সময়ের আদেশ- নিষেধ অনুসারে কার্যকর হয়। এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, নবীগণ ঐশীগ্রন্থ ও শরীয়তের বিভিন্নতার রহস্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেও এ সম্পর্কে কোন যথাযথ সূত্র হস্তগত করতে পারে না। যেমনি করে সে বিবেচনা করতে পারেনা যে, কোথায় এবং কখন অন্য কোন নবীর আবির্ভাব অথবা নতুন কোন শরীয়তের প্রবর্তন হওয়া উচিৎ। তবে এতটুকুই শুধু অনুধাবন করা যেতে পারে যে, যদি মানুষের জীবন ব্যবস্থা এমনটি হয় যে, কোন নবীর আহ্বান সারা বিশ্ববাসীর নিকট পৌছবে ও ভবিষ্যৎ বিশ্ববাসীদের জন্যে তার বাণী আবিকৃত ও সংরক্ষিত থাকবে এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে নতুন কোন শরীয়ত প্রবর্তনের ও এর পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না তবে অন্য কোন নবীরও প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

নবীগণের সংখ্যা :

যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নবীগণ ও ঐশী গ্রন্থসমূহের সংখ্যা নির্ধারণ করতে অপারগ এবং এ ধরনের বিষয়বস্তুর প্রমাণ, উদ্ধৃতিগত দলিল ব্যতীত অসম্ভব। পবিত্র কোরানে যদিও এ সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয় যে, মহান আল্লাহ সকল উম্মতের জন্যেই নবী প্রেরণ করেছেন।[২৭] কি নবীগণের সংখ্যা ও উম্মত সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বিবৃত হয়নি। শুধুমাত্র বিশোর্ধ সংখ্যক নবীর (আ.) নাম এবং অপর কিছু সংখ্যক নবীর কাহিনী সম্পর্কে (নাম না উল্লেখ করে) ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২৮] কি পবিত্র আহলে বাইত (আলাইহিমুসসালাম আজমাইন) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে এসেছে যে, মহান আল্লাহ একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী প্রেরণ করেছেন[২৯] এবং তাদের ধারা আবুল বাশার বা মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু হয়ে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আ'লিহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে যবনিকা রেখা টেনেছে।

আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ, নবী (نبی) নামকরণ, যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ উপাধি, তা ব্যতীতও নাজির (نذیر) মুনজির (منذیر) বাশির (بشیر) ও মুবাশ্যির (مبشّیر)[৩০] ইত্যাদি নামে

আখ্যায়িত হতেন এবং সালিহীন (صالحين) ও মোখলাসিন (مخلصين) রূপেও পরিগণিত হতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার রিসালাতেরও অধিকারী ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েতের ভাষায় এ ধরণের রাসূলগণের সংখ্যা তিনশত তের জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩১]

আর এ জন্যে অমরা এখানে নবুয়্যত ও রিসালাতের তাৎপর্য এবং নবী (نبي) ও রাসূলের (رسول) মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব।

নবুয়্যাত ও রিসালাত :

রাসূল (رسول) শব্দটির অর্থ হল সংবাদ বাহক। আর নবী (نبي) শব্দটি যদি نبأ উপাদান থেকে গঠিত হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ হল 'গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের অধিকারী এবং যদি نبو উপাদান থেকে সংগঠিত হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ হল 'সম্মানিত ও সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী'।

অনেকের মতে নবী শব্দটির অর্থ রাসূল শব্দটির অর্থ অপেক্ষা বিস্তৃততর। আর তা হল এরূপ : নবী অর্থ, যিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন - চাই তা অন্যের নিকট পৌছাতে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন বা না হন। কি রাসূল হলেন তিনিই যিনি প্রাপ্ত ওহী অপরের নিকট পৌছাতেও আদিষ্ট হয়েছেন।

কি এ দাবিটি সঠিক নয়। কারণ কোরানের কোন কোন আয়াতে 'নবী বিশেষণটি রাসূল বিশেষণের অব্যবহিত পরই উল্লেখ হয়েছে।[৩২] অথচ উপরোক্ত বক্তব্য অনুসারে যে বিশেষণটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর অর্থবহ (নবী) সে বিশেষণটি বিশেষ অর্থ প্রকাশক বিশেষনের (রাসূল) পূর্বেই উল্লেখিত হওয়া উচিৎ। তাছাড়া ওহী প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূলগণকেই (নবীদেরকে ব্যতীত) যে বিশেষভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে কোন দলিল নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, নবুয়্যতের মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি ওহীর ফেরেস্তাকে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখতে পান এবং জাগ্রত অবস্থায় শুধুমাত্র তার শব্দ শুনতে পান। কি রিসালাতের অধিকারী ব্যক্তি ওহীর ফেরেস্তাকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখতে পান।[৩৩]

উপরোক্ত পার্থক্যটিও শাব্দিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । তবে যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে তা হল এই যে, নবী (نبی) শব্দটি দৃষ্টান্তের (مصداق) দিক থেকে (ভাবার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে) রাসূল (رسول) শব্দটি অপেক্ষা বিস্তৃততর অর্থ বহন করে থাকে। অর্থাৎ সকল প্রেরিত পুরুষই নবুয়্যতের মর্যাদার অধিকারী। কি রিসালাতের অধিকার তাদের মধ্যে বিশেষ একশ্রেণীর জন্যে নির্দিষ্ট এবং পূর্বোল্লিখিত রেওয়ায়েত অনুসারে বাসূলগণের সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন। স্বভাবতঃই তাদের মর্যাদা, অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণের চেয়ে উর্ধ্বে যেমনি করে রাসূলগণের সকলেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে একরকম ছিলেন না।[৩৪] তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইমামতের সম্মানেও ভূষিত হয়েছিলেন।[৩৫]

পবিত্র কোরানে একদল নবীকে উলুল আজম (اولو العزم) নামে পরিচয় দেয়া হয়েছে, [৩৬] কি তাদের বিশেষত্বসমূহ সুনির্দিষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়নি। তবে আহলে বাইত আলাইহিমুসসালাতু ওয়স্সালামের বর্ণনা থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় উলুল আজম পাঁচজন ছিলেন। তারা যথাক্রমে : হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সা.)[৩৭] । আর তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ (চূড়ান্ত ধৈর্য ও স্থৈর্য ছাড়াও) ছিল এই যে, তাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়তের অধিকারী ছিলেন এবং সমসাময়িক কালের নবীগণ অথবা পরবর্তী নবীগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোন উলুল আজম রিসালাতের নিমিত্তে প্রেরিত হতেন বা নতুন কোন কিতাব ও শরীয়ত নিয়ে আসতেন তাদের শরীয়তের অনুসরণ করতেন।

একই সাথে সু ষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, একই সময়ে দু'নবীর আবির্ভাব সম্ভব। যেমন : হযরত লুত (আ.), হযরত ইব্রাহীমের (আ.) সমসাময়িক ছিলেন এবং হযরত হারুন (আ.), হযরত মুসার (আ.) সাথে যুগপৎ নবুয়্যত লাভ করেছিলেন। অনুরূপ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) ছিলেন হযরত ঈসার (আ.) সমসাময়িক।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

এ আলোচনার শেষাংশে আমরা নবুয়্যতের উপর কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করব :

ক) নবীগণ পর র পর রকে সত্যায়িত করতেন এবং পরবর্তী নবীর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করতেন।[৩৮] অতএব যদি কেউ নবুয়্যতের দাবি করে অথচ পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক নবীদেরকে অস্বীকার করে তবে সে মিথ্যাবাদী বৈ কিছু নয়।

খ) আল্লাহর নবীগণ স্বীয় দায়িত্ব পালনের জন্যে মানুষের নিকট কোন প্রতিদান আশা করতেন না।[৩৯] তবে একমাত্র ইসলামের নবীই (সা.) রিসালাতের বিনিময়ে স্বীয় আহলে বাইতের (আ.) জন্যে মানুষের নিকট তাদের আনুগত্য ও ভালবাসা (مودّة) কামনা করেছিলেন, যার অর্থ হল তাদেরকে অনুসরণের জন্যে গুরুত্বারোপ করা। প্রকৃতপক্ষে এর সুফল উম্মতের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)

বল, "আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আমার নিকট আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না"। (সূরা শুরা - ২৩)

(قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ)

বল, "আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহর নিকট"। (সূরা সাবা - ৪৭)

গ) কোন কোন নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে বিচার ও শাসনকার্যের মত দায়িত্বও লাভ করেছিলেন। উদাহরণতঃ পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সোলায়মানের (আ.) নাম স্মরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া সূরা নিসার ৬৪ তম আয়াত, যাতে সকল রাসূলেরই অনুসরণ নিরঙ্কুশভাবে মানুষের জন্যে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সকল রাসূলই এ ধরনের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

ঘ) জিন সম্প্রদায় যারা প্রকারান্তরে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে অবস্থান করে, তারা কোন কোন নবীর (আ.) আহবান সম্পর্কে অবগত হতেন। এ সম্প্রদায়ের ভাল ও পুণ্যবান নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন। তাদের মধ্যে হযরত মুসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারী বিদ্যমান।[৪০] আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ ইবলিসের অনুসরণ করে আল্লাহর নবীগণকে অস্বীকার করেছে।[৪১]

১০ম পাঠ

জনগণ ও নবীগণ

ভূমিকা :

পবিত্র কোরান যখন পূর্ববর্তী নবীগণকে স্মরণ করে, তাদের দীপ্তিময় ও কল্যাণময় জীবনের প্রান্ত থেকে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করে এবং ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকারের বিচ্যুতির মরিচা থেকে তাদের জীবন ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোকে মুক্তভাবে উপস্থাপন করে তখন নবীগণের (আ.) প্রতি বিভিন্ন উম্মতের প্রতিক্রিয়া বা ভূমিকা সম্পর্কেও আলোক পাত করার জন্যে উদার হস্ত থাকে। পবিত্র কোরান একদিকে যেমন নবীগণের (আ.) বিপরীতে মানুষের ভূমিকা এবং তাদের বিরোধিতার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করে, অপরদিকে তেমনি হিদায়াত ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে নবীগণ (আ.) কর্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি এবং কুফর, শিরক ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম সম্পর্কেও আলোকপাত করে। তদনুরূপ বিশেষ করে নবীগণের সাথে জনগণের পার রিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করে যা অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়কে ধারণ করেছে। এ আলোচ্য বিষয়টি যদিও মূল বিশ্বাসগত ও কালামশাস্ত্রগত বিষয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়, তবু একদিকে যেমন নবুয়্যত সম্পর্কে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দানের পাশাপাশি এ সম্পর্কে অনেক িধা- ন্দ্বের অবসান ঘটায় অপরদিকে তেমনি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার জন্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে মানুষ যে শিক্ষা লাভ করে তাতে অভূতপূর্ব গুরুত্ব বহন করে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য পাঠে আমরা এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করব।

নবীগণের (.**আ**) **প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া** :

যখন আল্লাহর নবীগণ (আ.) জনগণকে এক আল্লাহর উপাসনা করতে[৪২] ও তার আদেশের আজ্ঞাবহ হতে, মূর্তি ও মিথ্যা উপাস্যগুলোকে বর্জন করতে, শয়তান ও স্বেচ্ছাচারীদের নিকট থেকে দূরে থাকতে, অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার ও কদর্যপূর্ণ কর্ম থেকে বিরত হতে মানুষকে আহবানে উদ্যোগী হতেন, তখন সাধারণতঃ জনগণের বিরোধীতা ও তিরস্কারের সম্মুখীন হতেন।[৪৩] বিশেষ করে সমাজের ধনিক শ্রেনী ও সমাজপাতি, যারা আরাম- আয়েশে নিমগ্ন থাকত[৪৪] এবং স্বীয় ধন- সম্পদ, মর্যাদা ও বিদ্যা- বুদ্ধি নিয়ে অহংকার করত, [৪৫] তারা নবীগণের (আ.) বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হত। তারা অন্যান্য শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষকেও নিজেদের দিকে আকর্ষণ করত এবং সত্য পথের অনুসরণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখত।[৪৬] তবে ক্ষুদ্র কিছু জনসমষ্টি যারা সাধারণতঃ সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত, তারাই ক্রমাগত নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন।[৪৭] খুব কম ক্ষেত্রেই এ ঘটনা ঘটত যে, সঠিক বিশ্বাস ন্যায়- নীতি ও মহান আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে একটি সমাজ রূপ লাভ করেছে। উদাহরণতঃ যেমনটি হযরত সোলায়মানের (আ.) সময় ঘটেছিল।

যা হোক নবীগণের (আ.) শিক্ষার কোন কোন অংশ ক্রমান্বয়ে সমাজের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করত এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে বিস্তৃতিলাভ করত ও অনুসৃত হত। আবার কখনো কখনো কাফের সমাজপতিদের কৃতিত্বের বিষয় রূপে উপস্থাপিত হত। যেমন : বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঐশী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেন অথচ এর উৎসের নাম উচ্চারণে বিরত থাকেন ও নিজেদের চিন্তা ও চেতনা রূপে সমাজে উপস্থাপন করেন।

নবীগণের (**আ.**) **বিরোধিতা করার কারণ ও প্রবণতা** :

নবীগণের (আ.) বিরোধিতা করার সামগ্রিক কারণ, কুপ্রবৃত্তি ও উচ্ছৃংখল প্রবণতা ব্যতীত অন্যান্য কারণও ছিল[৪৮] যেমন : স্বেচ্ছাচারিতা, দাম্ভিকতা ও আত্মম্ভরিতা যা ধনিক, বণিক ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হত।[৪৯] এ ছাড়া পূর্ব পুরুষদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি- নীতির ও ভ্রান্ত মূল্যবোধের

গোড়ামী নবীগণের (আ.) প্রতিকূল সমাজে প্রচলিত ছিল ।[৫০] অনুরূপ অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থান অটুট রাখা ছিল ধনিক, শাসক ও বুদ্ধিজীবী কর্তৃক, নবীগণেরে (আ.) প্রতিকূলে অবস্থান নেয়ার অপর একটি শক্তিশালী কারণ।[৫১] অপরদিকে সাধারণ জনসমষ্টির অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছিল কাফের নেতৃবর্গ কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার এবং পূর্বপুরুষ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের পথ অনুসরণের এক বৃহৎ কারণ। আর এ জন্যে তারা নিজেদের অনুমান ও কল্পনার উপরই আত্মতুষ্টি লাভ করত এবং সে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত থাকত, যে ধর্ম সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোক, যারা সামাজিক মর্যাদায় ছিলেন বঞ্চিত ও উচ্চ শ্রেণী ও সংখ্যাগুরু কর্তৃক প্রত্যাখিত, তারা ব্যতীত কেউ গ্রহণ করেননি। তেমনি সমাজের এ সংখ্যালঘু বঞ্চিত শ্রেণীর উপর শাসকশ্রেণী ও স্বেচ্ছাচারিদের নি ষণের কথাও অগ্রাহ্য করার মত নয়।[৫২]

নবীগণের (.আ) সাথে বিরোধিতা করার পদ্ধতিসমূহ :

নবীগণের (আ.) প্রতিপক্ষরা তাদের প্রচার কার্যের সম্প্রসারণে বাঁধা প্রদানের জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল :

ক) অবজ্ঞা ও বিদ্রুপঃ প্রথমে একদল, আল্লাহর বার্তাবাহকগণকে অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ করার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বহানী করতে চেয়েছিল, [৫৩] যাতে সাধারণ জনগণ তাদেরকে কোন গুরুত্ব প্রদান না করে।

খ) অপবাদ ও কুৎসা রটনা : অতঃপর তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, অপবাদ দান ও কুৎসা রটনা করত। যেমন : তাদেরকে নির্বোধ মস্তিষ্কবিকৃত বলত[৫৪] এবং যখন মু'জিযাহ প্রদর্শন করতেন তখন তাদেরকে জাদুমন্ত্রের অপবাদ দিত।[৫৫] তদনুরুপ আল্লাহর বাণীসমূহকে রূপকথা বা পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বলে নামকরণ করত।[৫৬]

গ) ভ্রমাত্মক যুক্তি প্রদর্শন ও অহেতুক তর্ক : যখন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি সহকারে বক্তব্য রাখতেন অথবা সূন্দর বাগ্মিতা সহকারে বিতর্ক ও কথোপকথন করতেন কিংবা জনগণকে উপদেশ দিতেন এবং অবাধ্যতা, অংশীবাদ ও অত্যাচারের কুফল সম্পর্কে মানুষকে

সতর্ক করে দিতেন, তদনুরূপ আল্লাহর আনুগত্য করার লাভজনক ও শুভপরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতেন এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মকারিদেরকে ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান করতেন তখন কাফের গোত্রপতিরা জনগণকে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করতে নিষেধ করত। অতঃপর তারা দুর্বল ও বোকামিপূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে জবাব দিত এবং চেষ্টা করত সাজানো বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে প্রতারণা করতে[৫৭] ও নবীগণের (আ.) অনুসরণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে। আর এ কর্মে তারা সাধারণতঃ পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি অনুসরণ করত[৫৮] এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধিকে সাধারণ মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করত। অপরদিকে নবীগণের (আ.) অনুসারীগণের বৈষয়িক অস্বচ্ছলতা ও পশ্চাৎপদতাকে তাদের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের অসারতারূপে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করত।[৫৯] তারা বিভিন্ন অজুহাত, নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : কেন মহান আল্লাহ রাসূল ও প্রেরিত পুরুষগণকে ফেরেস্তাগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করেননি ? অথবা কেন কোন ফেরেস্তাকে তাদের সাথে প্রেরণ করেনি? কিংবা কেন তাদেরকে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি প্রদান করেননি ?[৬০] আবার কদাপি এ বাড়াবাড়ির মাত্রাটা এমন স্থানে পৌছত যে, বলত : আমরা একমাত্র তখনই ঈমান আনব যখন স্বয়ং আমাদের নিকট ওহী আসবে অথবা আল্লাহকে দেখতে পাব ও তার কথা প্রত্যক্ষভাবে শুনতে পাব।[৬১]

ঘ) ভীতি প্রদর্শন ও প্রলুব্ধকরণ : অপর যে পদ্ধতিটি পবিত্র কোরানে বিভিন্ন উম্মতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে তা হল, আল্লাহর নবীগণ ও তাদের অনুসারীগণকে বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার, দেশ ও শহর থেকে বহিষ্কার, পাথর নিক্ষেপ ও হত্যার ভয়-ভীতি প্রদর্শন।[৬২] অপরদিকে প্রলোভনের সকল মাধ্যমও তারা (পথভ্রষ্টরা) ব্যবহার করত এবং বিশেষ করে অজস্র সম্পদ ব্যয় করে জনগণকে নবীগণের (আ.) অনুসরণ থেকে বিরত রাখত।[৬৩]

ঙ) সহিংসতা ও হত্যা : অবশেষে নবী (আ.) গণের ধৈর্য, স্থৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতা[৬৪] এবং অপপ্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের সকল হাতিয়ারের কার্যকর ব্যবহার সত্ত্বেও সত্যবাদী নবীগণের সৎ

অনুসারীগণের অদম্য প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার পর্যবেক্ষণে নিরাশ হয়ে (মিথ্যাবাদীরা)সহিংসতার পথ বেছে নিত। যেমন : তারা অনেক নবীকেই হত্যা করেছিল।[৬৫] আর মানব সমাজকে প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত উৎকৃষ্টতম বৈভব ও অনুগ্রহ এবং সমাজের যোগ্যতম সংস্কারক ও পথপ্রদর্শকগণের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করেছিল ।

সামাজিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আল্লাহর কতিপয় রীতি- পদ্ধতি:

নবীগণের (আ.) নবুয়্যত লাভের পশ্চাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল এই যে, মানবসম্প্রদায় ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সম্পর্কে অবগত হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে ওহীর মাধ্যমে কাঁটিয়ে উঠবে অর্থাৎ তাদের প্রতি দলিল ও যুক্তি প্রদর্শন চূড়ান্ত করা।[৬৬] তবে মহান আল্লাহ স্বীয় রহমতের প্রতিফলন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্বাবধানের মাধ্যমে নবীগণের আহবানে সারা দেয়ার জন্যে জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতেন, যা মানুষের উৎকর্ষ প্রাপ্তির পথে সহায়ক হয়েছিল। যেহেতু সৃষ্টির সকল অপরিহার্য জ্ঞাতব্যের প্রতি উদাসীনতা ও অভাবমুক্ত হওয়ার উপলব্ধি[৬৭] ছিল খোদাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণ, সেহেতু প্রজ্ঞাবান প্রভু এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেন, যাতে নিজের অভাবের প্রতি মনোযোগ দেয়ার ক্ষেত্র, মানব সম্প্রদায়ের জন্যে প্রস্তুত হয় এবং উদাসীনতা, দাম্ভিকতা ও আত্মম্ভরিতার অবসান ঘটে। আর এ জন্যেই মহান আল্লাহ মানুষের সম্মুখে বিভিন্ন সংকট ও সমস্যার সৃষ্টি করতেন যাতে ইচ্ছাকৃত- অনিচ্ছাকৃত, যে কোন ভাবেই হোক নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কে তারা সচেতন হয় ও আল্লাহর দিকে মুখ ফিরায়।[৬৮]

কি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গৃহীত এ পদক্ষেপও সার্বিক ও সার্বজনীনভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে যারা অজস্র ধন- সম্পদের অধিকারী ছিল সুদীর্ঘ সময়ের অত্যাচার- অবিচার ও অন্যায়ের মাধ্যমে আরাম- আয়েশের সকল উপকরণ নিজেদের আয়ত্বে এনেছিল, কোরানের ভাষায় যাদের অন্তর প্রস্তরসম কঠিন হয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের চৈতন্য ফিরে পায়নি।[৬৯] তখনও তারা উদসীনতায় নিদ্রামগ্ন ও স্বীয় ভ্রান্ত পথেই যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল।

যেমন : নবীগণের (আ.) আদেশ, নিষেধ ও সতর্কবাণীও তাদের জন্য ফলপ্রসূ হয়নি। আর যখনই মহান আল্লাহ সংকট ও সমস্যাসমূহ দূরীভূত করে মানুষের জন্যে তার নিয়ামতসমূহকে পুনরায় প্রেরণ করতেন, তখন তারা বলত : সুখ-দুঃখ, দুর্দশা-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির পালা পরিবর্তন ও দোদুল্যমানতা মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ, যা পূর্বপুরুষদের জন্যেও আপতিত হয়েছিল।[৭০] আর এ ভাবে তারা পুনরায় অন্যায় অত্যাচারের হাত প্রসারিত করে ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার পাহাড় গড়ে তুলতে প্রয়াসী হত। অথচ তারা ভুলে যেত যে, ধণ-সম্পদের এ সংগ্রহই তাদের ইহ ও পারলৌকিক দুর্ভাগ্যেও ফাঁদ, যা প্রভুর পক্ষ থেকে পাতা হয়েছে।[৭১]

যা হোক নবী (আ.) গণের অনুসারীগণ যখন সংখ্যা ও সামর্থ্যরে দিক থেকে এমন পরিমাণে পৌছত যে, একটি স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা ও নিজেদেরকে রক্ষা করতে এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে সংগ্রাম করতে সক্ষম, তখন জিহাদের জন্য আদিষ্ট হতেন।[৭২] আর তখন নবীগণের (আ.) মাধ্যমে কাফির ও অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসত।[৭৩] অন্যথায় মু'মিনিন, নবীগণের (আ.) আদেশে কাফেরদের থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। অতঃপর আল্লাহর আযাব অন্য কোনভাবে ঐ সমাজের উপর পতিত হত, যে সমাজের সংশোধন ও প্রত্যাবর্তনের কোন প্রত্যাশা থাকত না।[৭৪] আর এটাই হল মানব সমাজের তত্ত্বাধানের ক্ষেত্রে প্রভুর অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় নিয়ম।[৭৫]

১১তম পাঠ

ইসলামের নবী (.সা)

ভূমিকা :

শত- সহস্রাধিক আল্লাহর নবী ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং মানব সম্প্রদায়ের হিদায়াত ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথ রূপে পালন করতঃ মানব সমাজে জা ল্যমান কীর্তিসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন জনসমষ্টিকে সঠিক বিশ্বাস ও সমুন্নত মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং অন্যদের জন্যে পরোক্ষ ভূমিকা রেখে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তাওহীদি ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ঐ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নবীগণের (আ.) মধ্যে হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থান ও কাল উপযোগী ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিয়ম- নীতি ও চারিত্রিক দায়িত্ব সমন্বিত ঐশী কিতাবসমূহ লাভ করেছিলেন এবং মানুষের নিকট উপস্থাপন করেছিলেন। কি এ কিতাবগুলো হয় কালের আবর্তে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল অথবা যথেচ্ছা শব্দগত ও ভাবার্থগত বিচ্যুতিতে পতিত হয়েছিল। ফলে সকল ঐশী ধর্ম ও শরীয়তসমূহ বিকৃতরূপ ধারণ করেছিল । যেমন : মুসা (আ.) এর তৌরাতে অসংখ্য বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং ঈসার (আ.) ইঞ্জিল নামক কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। বরং তার অনুসারী বলে পরিগণিত হত এমন কিছু ব্যক্তিবর্গের হস্তলিপিসমূহকে সংগ্রহ করে পবিত্র বাইবেল রূপে নামকরণ করা হয়েছে।

যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই যদি প্রথম ও িতীয় সংস্করণ নামক পুস্তক য়ের (তৌরাত ও ইঞ্জিল) বিষয়বস্তুকে বিবেচনা করে তবে দেখতে পাবে যে, এ গুলো কোনটিই হযরত ঈসা ও মুসার

(আ.) উপর অবতীর্ণ কিতাব নয়। যেমন : তৌরাত মহান আল্লাহকে (العياذ بالله) এমনভাবে মানুষের মত করে উপস্থাপন করে যে, তিনি অনেক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না[৭৬] বা অনেকবার স্বীয় কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়েছেন[৭৭] অথবা তার এক বান্দার [হযরত ইয়াকুব (আ.)] সাথে কুস্তি লড়তে গিয়ে পারাস্তপ্রায় হয়ে, অবশেষে প্রতিপক্ষের নিকট অনুরোধ করেন তাকে ছেড়ে দিতে যাতে তার বান্দাগণ তাকে এ দুরবস্থায় দেখতে না পায়।[৭৮] এ ছাড়া আল্লাহর নবীগণ (আ.) সম্পর্কেও একাধিক কুৎসার অবতারণা করেছে। (العياذ بالله) যেমন : অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়েছে হযরত দাউদের (আ.) উপর[৭৯] অনুরূপ মদ পান ও মাহারামের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়েছে হযরত লুতকে (আ.)[৮০] । এ সকল মিথ্যাচার ছাড়াও হযরত মুসার (আ.) (তৌরাতের বাহক) মৃত্যু কোথায় এবং কিভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছে।[৮১]

এ কিতাব হযরত মূসার (আ.) নিকট অবতীর্ণ হওয়া কিতাব নয়, তা প্রমাণের জন্যে শেষোক্ত বিষয়াটিই কি যথেষ্ট নয় ?

অপরদিকে ইঞ্জিলের অবস্থা আর ও লজ্জাষ্কর। কারণ প্রথমতঃ হযরত ঈসার (আ.) উপর অবতীর্ণ এমন কোন কিতাব খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি স্বয়ং ীষ্ট ধর্মের অনুসারীরাও এরূপ দাবি করেন না যে, বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিল, সে কিতাবই যা মহান আল্লাহ হযরত ঈসার (আ.) উপর অবতীর্ণ করেছেন। বরং এর বিষয়বস্তুকে ঈসার (আ.) কয়েকজন সহচর কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন বলে গণনা করা হয়ে থাকে। তদুপরি উক্ত কিতাবে মদ পাণের বৈধতা প্রদানসহ এর আবিষ্কারকে ঈসার (আ.) মু'জিযাহরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৮২] এককথায় বলা যায়, এ দু'জন মহান নবীর (আ.) নিকট প্রেরিত ওহীসমূহ বিকৃত হয়ে গিয়েছে। ফলে সেগুলো মানব সম্প্রদায়কে হিদায়াত করতে স্বকীয় ভূমিকা রাখতে অপারগ। তবে কেন এবং কিরূপে এ সকল বিচ্যুতি ও বিকৃতি সংঘটিত হয়েছিল, সে ঘটনা অনেক বিস্তৃত, যার বর্ণনা দেয়ার সুযোগ এখানে নেই ।[৮৩]

ীষ্টোত্তর ষষ্ঠ শতাীতে যখন সমগ্র বিশ্ব অত্যাচার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, হিদায়াত ও মুক্তির সকল আলোক বর্তিকাগুলো যখন নিভন্তপ্রায়, ঠিক এমনই সময় মহান আল্লাহ তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে (সা.) তদানিন্তন সময়ের অন্ধকারতম ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে প্রেরণ করেছেন যাতে ওহীর জ্যোতির্ময় শিখা সর্বকালের জন্যে এবং সকল মানুষের জন্যে প্রজ্জলিত হয়। আর সেই সাথে চিরন্তন ও অবিক্রিত অপরিবর্তিত ঐশী কিতাবকে মানুষের নিকট পৌছে দেয়া যায় এবং প্রকৃত জ্ঞাতব্য, ঐশী প্রজ্ঞাসমূহ ও বিধি- বিধান সম্পর্কে মানব সম্প্রদায়কে অবহিত করা যায়। আর সেই সাথে সকল মানুষ ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়।[৮৪]

আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (আ.) তার বক্তব্যের একাংশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবীরূপে আত্মপ্রকাশের সমসাময়িক বিশ্বপরিস্থির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

মহান আল্লাহ মহানবীকে (সা.) এমন এক সময় রিসালাতের অধিকারী করেছিলেন যখন পূর্ববর্তী নবীগণ (আ.) থেকে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহীত হয়ে গিয়েছিল, মানবকুল সুদীর্ঘ ও গভীর নিদ্রায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল, বিশৃংখলার সলিতাগুলো সারা বিশ্বে লে উঠেছিল, কীর্তির বাঁধনগুলো পর র বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, যুদ্ধবিগ্রহের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে লছিল, পাপ ও অজ্ঞতার তিমিরে নিমগ্ন ছিল সারা বিশ্ব, কপটতা ও প্রতারণা ছিল বিবস্ত্র, মানবজীবন বৃক্ষের শ্যামল পত্ররাজি শুষ্কপ্রায়, ফলধারণের কোন আশাই তাতে ছিল না, জলরাশি অতলে গিয়েছিল হারিয়ে, হিদায়াতের দীপগুলো হিমশীতল ও নিস্প্রভ হয়ে গিয়েছিল, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার ধ্বজাগুলো স্ব- শব্দে ছিল উড্ডীয়মান, কদর্য ও হতভাগ্য মানব সম্প্রদায়ের উপর স্বীয় কুৎসিত রূপ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল। এ অন্যায় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অহন, যখন অনিয়ম ও বিশৃংখলা ব্যতীত কিছু বয়ে আনত না এবং জনগণের উপর যখন ভয়- ভীতি ও নিরপত্তাহীনতা আধিপত্য বিস্তার করেছিল তখন রক্তললুপ অসি ব্যতীত মানুষের কোন আশ্রয়স্থল ছিলনা।[৮৫]

ইসলামের নবীর (সা.) আবির্ভাবের সময় থেকে প্রত্যেক সত্যান্বেষী মানুষের জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি (খোদা পরিচিতির পর) হল, হযরত (সা.) এর নবুয়্যত ও রিসালাত সম্পর্কে

এবং পবিত্র ধর্ম ইসলামের উপর গবেষণা করা। এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সঠিক বিশ্বাসসমূহকে প্রতিপাদনের এবং মূল্যবোধসমূহ ও এ বিশ্বের শেষাবধি সকল মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে বর্ণনা প্রদানের নিশ্চিত পথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শের অন্যান্য বিষয়সমূহের সমাধানের চাবিকাঠি হস্তগত হয়। আর সেই সাথে যুগপৎ পবিত্র কোরানের সত্যতা এবং মানবসম্প্রদায়ের নিকট বিদ্যমান বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত একমাত্র ঐশী পুস্তক হিসেবে এর বিশ্বস্ততাও প্রতিপন্ন হয়ে থাকে ।

ইসলামের নবীর (.**সা**) **রিসালাতের প্রমাণ** :

সাতাশতম পাঠে বলা হয়েছে যে, নবীগণের নবুয়্যত তিনটি উপায়ে প্রতিপাদনযোগ্য : একটি হল তাদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে জানা ও নিশ্চিত সূত্রের ব্যবহার । িতীয়টি হল পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্য াণী। আর তৃতীয় উপায়টি হল মু'জিযাহ প্রদর্শন।

ইসলামের নবী (সা.) এর ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতিই প্রযোজ্য ছিল। মক্কার মানুষ হযরত (সা.) এর সুখ্যাতিপূর্ণ চল্লিশ বছরের জীবন-যাপন পদ্ধতি খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন। তার এ দীর্ঘ চল্লিশ বছরে এমন কোন ক্ষুদ্রতম বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়নি যা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। উপর তার সত্যবাদিতা ও সদাচারের এমন পরিচয় তারা পেয়েছিলেন যে, তাকে "আল-আমিন " বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। স্বভাবতঃই এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যা বলা ও মিথ্যা দাবি করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

অপরদিকে : পূর্ববতী নবীগণ (আ.) ও হযরতের (সা.) নবুয়্যতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।[৮৬] এ জন্যে একদল আহলে কিতাব তার আবির্ভবের আশায় অপেক্ষমাণ ছিলেন এবং তার সু   ষ্ট ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সম্পর্কেও তারা অবগত ছিলেন।[৮৭] এমনকি আরব মোশরেকরা বলত যে, হযরত ইসমাঈলের (আ.) সন্তানদের মধ্যে (যারা আরব সম্প্রদায় ও গোত্রসমূহের প্রতিষ্ঠাতা) এমন কেউ নবুয়্যত প্রাপ্ত হবেন যে, পূর্ববর্তী সকল নবী ও সকল তাওহীদি ধর্মকে সত্যায়িত করবেন।[৮৮] ইহুদী ও নাসারাদের মধ্য থেকে একদল পণ্ডিত এ ভবিষ্যৎ বাণীর ভিত্তিতেই রাসূল

(সা.) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন [৮৯]- যদিও অন্য একদল আবার কুমন্ত্রণা ও শয়তানী প্রবণতার কারণে ীন ইসলামকে গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল।

পবিত্র কোরান এ পদ্ধতি সম্পর্কে ইংগিত করতে গিয়ে বলে :

(أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ)

এই নিদর্শনই কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যা সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের আলেমগণ বিশেষভাবে অবগত আছে!? (সূরা শুয়ারা- ১৯৭)

বনী ইসরাঈলের আলেমদের মাধ্যমে এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্য াণী ও পরিচয় করিয়ে দেয়ার ভিত্তিতে ইসলামের নবীর (সা.) পরিচয় লাভ একদিকে যেমনি সকল আহলে কিতাবের জন্যে হযরতের (সা.) রিসালাতের সত্যতার সু   ষ্ট দলিল ছিল। অপরদিকে তেমনি সুসংবাদ প্রদানকারী নবীগণের সত্যবাদিতার এবং তদনুরূপ অন্যান্যদের জন্যে হযরত মুহম্মদ (সা.) এর সত্যতার, চূড়ান্ত ও তুষ্ট প্রমাণ রূপে পরিগণিত হত। কারণ এ ভবিষ্য াণীসমূহের সত্যতা এবং এর সাক্ষী ও হযরত (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত নিদর্শনসমূহকে তারা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ ও নিজেদের জ্ঞান ারা উপলব্ধি করতেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, এ বিকৃত তৌরাত ও ইঞ্জিলেই এ ধরনের সুসংবাদগুলোকে নির্মূল করার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এমন সকল বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় যা সত্যান্বেষীদের জন্যে সু   ষ্ট প্রমাণ বহন করে। যেমন : ইহুদী ও নাসারা আলেমগণের মধ্যে অনেকেই যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন, তারা এ সকল বিষয় ও সুসংবাদের মাধ্যমেই হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পবিত্র ীন ইসালামে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।[৯০]

অনুরূপ মহানবী (সা.) কর্তৃক অসংখ্য মু'জিযাহ প্রদর্শিত হয়েছিল, যা ইতিহাস ও হাদীসগ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এ গুলোর অধিকাংশই বহুল আলোচিত হাদীসের অন্তর্গত' হয়েছে।[৯১] তবে সর্বশেষ নবী ও তার চিরন্তন ীনের পরিচয় দানের ক্ষেত্রে প্রভুর অনুগ্রহের দাবি হল : সমসাময়িক মানুষের জন্যে চূড়ান্ত রূপে দলিল - মু'জিযাহসমূহ প্রদর্শন ও

অন্যরা সংগতভাবে উদ্ধৃতিগত পথে ঐ গুলো সম্পর্কে অবগত হবে; তদুপরি এমন এক অমর ও চিরন্তন মু'জিযাহ তাকে সম্প্রদান করবেন, যা সর্বদা সর্বযুগের বিশ্ববাসীর জন্যে চূড়ান্ত দলিল হিসেবে থাকবে। আর তা হল পবিত্র কোরান।

অতএব পরবর্তী পাঠে আমরা এ সম্মানিত গ্রন্থের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।

১২তম পাঠ

পবিত্র কোরানের অলৌকিকত্ব

পবিত্র কোরান হল একটি মু'জিযাহ :

পবিত্র কোরানই একমাত্র গ্রন্থ যা দৃঢ় কন্ঠে ও সু ষ্ট রূপে ঘোষণা করেছে যে, কেউই এর সমকক্ষ কোন গ্রন্থ আনতে সক্ষম হবে না। এমনকি যদি সমস্ত মানুষ ও জিন্ন সম্প্রদায় পার রিক সহযোগিতার মাধ্যমেও চেষ্টা করে তথাপি এ ধরনের কর্ম সম্পাদনে সমর্থ্য হবে না।[৯২] তদুপরি সামগ্রিক কোরানের মত কোন গ্রন্থ যে আনতে পারবে না, কেবলমাত্র তা- ই নয়; বরং দশটি সূরা[৯৩] এমনকি এক লাইন বিশিষ্ট একটি সূরাও আনতে অক্ষম।[৯৪]

অতঃপর অধিক গুরুত্বসহকারে সকলের সম্মুখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে প্রতি ন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়েছে এবং এ ধরনের কর্ম সম্পাদনে তাদের অক্ষমতাকে এ গ্রন্থ ও ইসলামের প্রিয় রাসূল (সা.) এর রিসালাতের ঐশ্বরিক হওয়ার দলিল বলে উল্লেখ করেছে।[৯৫]

অতএব এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এ পবিত্র গ্রন্থ নিজের মু'জিযাহ হওয়ার দাবি করে এবং এর বাহক একে চিরন্তন মু'জিযাহ ও স্বীয় নবুয়্যতের স্বপক্ষে সকল বিশ্ববাসীর জন্যে সর্বকালীন চূড়ান্ত দলিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অদ্যাবধি চতুর্দশ শতাব্দী অতিক্রম হওয়ার পরও প্রভুর এ আহ্বান অহর্নিশ শত্রু ও মিত্রের প্রচার মাধ্যম থেকে বিশ্ববাসীর কর্ণগোচর হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত নিজের স্বপক্ষে চূড়ান্ত দলিল উপস্থাপন করে চলছে ।

অপরদিকে আমরা জানি যে, ইসলামের নবী (সা.), তার প্রকাশ্য আহ্বানের প্রারম্ভেই অবাধ্য ও প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যারা এ ঐশী ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন প্রকারের প্রচেষ্টা ও পন্থা অবলম্বনেই পিছপা হয়নি। অবশেষে সর্বপ্রকারের ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের কোন কার্যকারিতা না দেখে নিরাশ হয়ে হযরতকে (সা.) হত্যার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কি মহান আল্লাহর তত্ত্বাবধানে রাতের অন্ধকারে গোপনে মদীনায়

হিজরতের মাধ্যমে এ চক্রান্তটিও ব্যর্থতায় পর্যববসিত হয়। হিজরতের পরেও মোশরেক ও তাদের দোসর ইহুদীদের সাথে একাধিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে জীবনের পবিত্রতম অবশিষ্ট বছরগুলো অতিবাহিত করেন। রাসূলের (সা.) তিরোধানের পর থেকে অদ্যাবধি আভ্যন্তরীণ মোনাফিক ও বহিঃশত্রুরা এ ঐশী জ্যোতিশিখাকে নির্বাপিত করার জন্যে সদা সচেষ্ট ছিল এবং আছে। আর এ কর্মে তারা এমন কোন প্রকার পন্থা অবলম্বনেই কুন্ঠাবোধ করেনি বা করে না। আর পবিত্র কোরানের সমকক্ষ এমন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হত, তবে কখনোই এ কর্ম থেকে তারা পিছপা হত না।

বর্তমান সময়েও বিশ্বের সকল বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলো ইসলামকেই তাদের স্বৈরাচারী জালিম সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছে এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। আর এ জন্যে বৈষয়িক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সম্প্রচারগত ইত্যাদি সকল প্রকারের উপকরণই হাতে তুলে নিয়েছে। যদি সম্ভব হত তবে পবিত্র কোরানের কোন ক্ষুদ্রতম সূরা সদৃশ একটি লাইন প্রণয়নে প্রয়াসী হত এবং সকল সমষ্টিগত প্রচার মাধ্যম ও বিশ্বপ্রচার মাধ্যমে তা তুলে ধরত। কারণ এ কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ, স্বল্পতম ব্যয়সাপেক্ষ এবং ইসলাম ও এর সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলপ্রসূ।

অতএব সকল সত্যান্বেষী বিবেকবান মানুষই উপরোক্ত বিষয়টির আলোকে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে যে, পবিত্র কোরান হল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও অনানুকরণযোগ্য গ্রন্থ এবং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষেই, কোন প্রকার শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই এর সদৃশ কোন গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এটি এমন একটি গ্রন্থ যা, মু'জিযার সকল বৈশিষ্ট্যের (অলৌকিক হওয়া, ঐশ্বরিক ও অনানুকরণযোগ্য হওয়া, নবুয়্যতের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত হওয়া) অধিকারী। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মহানবী (সা.) এর আহ্বানের বৈধতার এবং ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ও চূড়ান্ত দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়। মানব সম্প্রদায়ের উপর প্রভুর পক্ষ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হল এটাই যে, এ সম্মানিতগ্রন্থকে এরূপে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে চিরন্তন মু'জিযাহরূপে সর্বদা বিদ্যমান থাকতে পারে এবং স্বীয় সঠিকতা ও

সত্যতার স্বপক্ষে এমনভাবে দলিল উপস্থাপন করতে পারে, যাকে অনুধাবনের জন্যে কোন প্রকার শিক্ষা- দীক্ষার প্রয়োজন নেই; আর সকল মানুষের জন্যেই তা বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হবে।

পবিত্র কোরানের অলৌকিক বিষয়সমূহ :

আমরা সংক্ষেপে ও নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছি যে, মর্যাদাবান কোরান হল আল্লাহর বাণী, যা অলৌকিকতাপূর্ণ। এখন আমরা এর অলৌকিক কিছু দিক তুলে ধরব :

ক) ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বাক্যালংকারের গভীরতা :

কোরানের প্রধান অলৌকিকত্ব হল তার ভাষার প্রাঞ্জলতা (فصاحت) ও বাক্যালংকারের গভীরতায় (بلاغت)। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তার অভিব্যাক্তিসমূহ প্রকাশের জন্য সর্বাবস্থায় পরম বাগ্মীতা, ভাষা শৈলীতা, সুন্দরতম গাঁথুনী, সুনিপুণতম সুরলহরী ব্যবহার করেছেন, যা উত্তমরূপে ও সু ষ্টরূপে, বাঞ্ছিত অর্থ শ্রোতা সাধারণের নিকট পৌছায়। আর সমুন্নত ও যথাযথ অর্থের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে এ ধরনের শব্দ ও বাক্যের সমাবেশ কেবলমাত্র তার জন্যেই সম্ভব, যিনি ভাষা শৈলীতা, সূক্ষ্ম অর্থসমূহ ও এতদুভয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার রিক সম্পর্কের উপর যথেষ্ট দক্ষতা ও পারদর্শিতার অধিকারী এবং যিনি পারিপার্শিকতা ও কাংখিত অর্থের গুণাগুণ বিবেচনা করে, অবস্থা ও মানের দাবি বজায় রেখে সর্বোত্তম শব্দ ও বাক্যসমূহকে নির্বাচন করতে সক্ষম। আর প্রভুর পক্ষ থেকে ওহী ও ইলহাম ব্যতীত এ ধরনের জ্ঞানগত দক্ষতা অর্জন কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

কোরানের আকর্ষণীয় সুরের সৌন্দর্য সমাহার ও আধ্যাত্মিকতা সকলের জন্যে এবং এর ভাষা শৈলিতা ও বগ্মিতা, আরবী ভাষা, তার প্রাঞ্জলতা ও বাক্যালংকারের কৌশল সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তির জন্যে বোধগম্য। কি কোরানের ভাষা শৈলিতা ও বাগ্মিতার অলৌকিকত্ব, তার পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব, যিনি বাগ্মিতা ও বাকপটুতার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে পরম দক্ষতা ও পারদর্শিতায় অধিকারী।

আর এ রকম কোন ভাষা বিশেষজ্ঞ, অন্যান্য বাগ্মিতাপূর্ণ ও প্রাঞ্জলতাপূর্ণ বক্তব্যের সাথে তুলনা করে স্বীয় যোগ্যতা পরীক্ষা করে থাকেন। আরব কবি, সাহিত্যিক ও গায়করা এ কর্মটি দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করতেন। কারণ আরবদের বৃহত্তম শিল্প ছিল বাকপটুতা, যা কোরান অবতীর্ণ হওয়ার সময় চরম বিকাশ লাভ করেছিল এবং সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাসমূহকে সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে নির্বাচন ও উপস্থাপন করতেন।

মূলতঃ প্রভুর প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের দাবি এটাই যে, প্রত্যেক নবীকে (আ.) সমসাময়িক কালের প্রচলিত জ্ঞান ও শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মু'জিযাহ প্রদান করবেন, যাতে মানবকীর্তির উপর তার অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব সু ষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। যেমন : ইমাম হাদী (আ.) এর নিকট ইবনে সিক্কিত জানতে চেয়েছিল : "মহান আল্লাহ কেন মু'জিযাহ হিসেবে হযরত মুসাকে (আ.) দিয়েছিলেন শুভ্রোজ্জল হাত ও ড্রাগণ বা বিশালাকার সর্পে রূপান্তরিত হতে সক্ষম যষ্ঠি এবং হযরত ঈসাকে (আ.) দিয়েছিলেন অসুস্থতা থেকে আরোগ্যদানের ক্ষমতা; আর ইসলামের নবীকে (সা.) দিয়েছিলেন পবিত্র কোরান ?" জবাবে ইমাম হাদী (আ.) বললেন : হযরত মুসার (আ.) সময় প্রচলিত নৈপুণ্য ছিল যাদুবিদ্যার। আর এ জন্যে মহান আল্লাহ তাকে জনগণের ক্রিয়াকলাপের সদৃশ মু'জিযাহ প্রদান করেছেন, যাতে ঐ রকম (মু'জিযাহ) কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারে। আবার হযরত ঈসার (আ.) সময় প্রচলিত ছিল নিপূণ চিকিৎসাবিদ্যা। তাই মহান আল্লাহ তাকে নিরাময়ের অযোগ্য রোগ থেকে মুক্তিদানের জন্যে মু'জিযাহ দিয়েছেন, যাতে এর অলৌকিকত্ব সম্পর্কে উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারে। কি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময় প্রচলিত ছিল বাগ্মিতা, শোকগাঁথা ও কাব্যিক নৈপূণ্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানকে সুন্দরতম রূপে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে এর আলৌকিকতাপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে পারে।[৯৬]

তদানিন্তন সময়ের ওয়ালীদ ইবনে মু'গাইরায়ে মাখযুমি, ওৎবাহ ইবনে রাবিয়া, তোফাইল ইবনে আমরের মত উচ্চতর পর্যায়ের ভাষাবিশারদগণও, কোরানের পরম বাগ্মিতা ও বাকপটুতার এবং মানুষের উৎকৃষ্টতম বাক্যালংকার সমন্বিত বক্তব্যের উপর এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা নির্দিধায় স্বীকার

করেছেন।[৯৭] প্রায় এক শতাব্দী পর আবিল আওজা, ইবনে মুকুফফা, আবু শাকির দীসানী এবং আব্দুল মালিক বাসরির মত ব্যক্তিবর্গ সিদ্ধান্ত নিলেন কোরানের সাথে স্বীয় যোগ্যতার তুলনা করবেন। অতঃপর পূর্ণ এক বছর এ কর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কি ন্যূনতম কর্মও প্রদর্শন করতে পারেন নি। অবশেষে এ ঐশীগ্রন্থের বিরাটত্বের সম্মুখে অক্ষম ও হতবিহ্বল হয়ে পরজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যখন মসজিদুল হারামে তাদের এক বছরের কর্মের বিচার-বিশ্লেষণ চলছিল, তখন ইমাম সাদিক (আ.) তাদেরকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন এবং কেরোনের এ আয়তটি আবৃতি করছিলেন :

(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا)

বল, যদি এই কোরানের অনুরূপ কোরান আনয়নের জন্যে মানুষ ও জিন্ন সমবেত হয় এবং তারা পর রকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। (সূরা ইসরা - ৮৮)

খ) নবীর (সা.) উম্মী হওয়া :

পবিত্র কোরান এমন এক গ্রন্থ যা তার ক্ষুদ্র কলেবরে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিকে সমন্বিত করেছে। আর এ গুলোর প্রত্যেকটির পরিপূর্ণ পর্যালোচনার জন্যে একাধিক ।

বিশেষজ্ঞ পরিষদের প্রয়োজন যারা বর্ষ পরম্পরায় এ গুলোর উপর গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় রত হবেন এবং পর্যায়ক্রমে এতে সন্নিবেশিত রহস্যসমূহ উদঘাটন করবেন। আর অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। কি সকল বাস্তবতা ও রহস্য উদঘাটন, ঐশীজ্ঞানের অধিকারী এবং মহান আল্লাহর অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়।

এ বৈচিত্রের সমাহার যা সুগভীর ও সমুন্নত পরিচিতি, উচ্চতর ও অমূল্য চারিত্রিক নির্দেশনা, ন্যায় ও দৃঢ়তম আইন-কানুন, বান্দাদের জন্যে প্রজ্ঞাময় আচার নীতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিয়ম, সর্বাধিক লাভজনক উপদেশ, শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক বিষয়, গঠনমূলক প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার

সর্বোত্তম নীতিসমূহ, এককথায় মানুষের ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল নীতিকে অভূতপূর্ব ও অভিনব পন্থায় এরূপে সমন্বিত করেছে যে, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

জ্ঞান- বিজ্ঞান ও বাস্তবতার এ অপূর্ব সমন্বয় সাধন নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কর্ম। কি বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, এ অপূর্ব সমন্বয়ের অধিকারী গ্রন্থটি, এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে যিনি জীবনে কখনোই পাঠশালায় যাননি, কারও কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, পত্রপৃষ্ঠে কলম চালাননি এবং যিনি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দূরপ্রান্তে অবস্থিত এক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। আরও অধিক আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, তার চল্লিশ বছরের জীবনে নবুয়্যত ঘোষিত হওয়ার পূর্বে এ ধরনের বক্তব্যের কিছুই শ্রুত হয়নি। এমন কি নবুয়্যতের সময়েও, যা কিছু ওহীরূপ বিবৃত হত, তা সর্বদা এমন এক বিশেষ পদ্ধতি ও সূত্র এবং সাজুয্য বজায় রাখত যা সু ষ্টরূপে তার অন্যসকল বক্তব্য থেকে স্বতন্ত্র ছিল। আর এ গ্রন্থ ও তার অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সু ষ্টরূপে বোধগম্য ছিল।

পবিত্র কোরান এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলে :

(وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ)

তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং সহস্তে কোন কিতাব লেখনি যে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। (সূরা আনকাবুত- ৪৮)

অপর এক স্থানে বলা হয়েছে :

(قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)

বল, আল্লাহর সেরূপ অভিপ্রায় হলে আমিও তোমাদের নিকট তা পাঠ করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। আমি তো এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি, তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না ? (সূরা ইউনূস - ১৬)

খুব সম্ভবত : সূরা বাকারার নিম্নবর্ণিত আয়তটিও এ অলৌকিক বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করছে।

(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ)

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর। (সূরা বাকারা- ২৩)

উপরোক্ত আয়তটিতে "مثله"এর সাথে যুক্ত সর্বনামটি (ه), "عبدنا" (অর্থাৎ আমাদের মনোনিত বান্দা) শব্দটির দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

সিদ্ধান্ত : (অসম্ভব সত্ত্বেও যদি) আমরা ধরে নিই যে, শত শত গবেষক ও বিশষজ্ঞ দলের পার রিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ে এ ধরনের একটি পুস্তক প্রণয়ন সম্ভব, তবে কখনোই একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে, এ কর্ম সাধন সম্ভব বলে ধারণা করা যায় না।

অতএব এ বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সমন্বিত গ্রন্থের প্রকাশ, বিশেষ করে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি কারও নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেননি নিঃসন্দেহে এর অলৌকিত্বের অপর একটি দিক।

(গ) সুঙ্গতি ও বিরোধহীনতা :

পবিত্র কোরান এমন এক গ্রন্থ, যা মহানবীর (সা.) তেইশ বছরের রিসালাতের জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রিয় নবীর (সা.) জীবনের এ অধ্যায়টি ছিল সংকটময় উত্থান- পতন, তিক্ত- মধুর ঘটনা বহুল। অথচ এ বিস্ময়কর অস্থিতিশীল অবস্থা, পবিত্র কোরানের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও অলৌকিক রীতি- পদ্ধতির উপর কোন প্রভাব ফেলেনি। আর বিষয়বস্তু ও গাঠনিক দিক থেকে এ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য এর অলৌকিকত্বের অপর দু'টি দিকের মতই একটি দিক বলে পরিগণিত। স্বয়ং পবিত্র কোরান এ সম্পর্কে বলে :

(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)

তবে কি তারা কোরান সম্পর্কে অনুধাবন করে না ? এটা যদি অল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে হত তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত। (সূরা নিসা- ৮২)

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক মানুষেরই কমপক্ষে দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে। একটি হল, পর্যায়ক্রমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে তার বক্তব্যে এর প্রতিফলন ঘটে। স্বভাবতঃই বিশ বছরের ব্যবধানে তার বক্তব্যসমূহের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। অপরটি হল, জীবনের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ বিভিন্ন মানসিকতা, আবেগ ও অনুভূতি যেমন : আশা- নিরাশা, আনন্দ- বেদনা, উে গ- উৎকণ্ঠা ও স্থৈর্যের সৃষ্টি করে। আর এ ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্তন ব্যক্তির চিন্তা, কর্ম ও ব্যবহারে যথাযথ প্রভাব ফেলে এবং স্বভাবতঃই এ পরিবর্তনের তীব্রতা তার বক্তব্যের মানেও তীব্র প্রভাব ফেলে । প্রকৃত পক্ষে বক্তব্যের পরিবর্তন, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের অনুগামী, যা স্বয়ং প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের অনুগামী।

এখন যদি ধারণা করি যে, পবিত্র কোরান মহানীব (সা.) এরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত কীর্তি, যিনি উল্লিখিত পরিবর্তনশীল অবস্থার সীমানায় অবস্থান করেছেন, তবে তার জীবনের এ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সংগত কারণেই বিন্যাস ও বিষয়বস্তুতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়ার কথা। অথচ এ ধরনের কোন ৈ ততার লেশমাত্র পবিত্র কোরানে নেই।

অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, কোরানের বিষয়বস্তু ও অলৌকিক সাহিত্যমানের মধ্যে সুসংগতি ও বিরোধহীনতা এ পবিত্র গ্রন্থ যে, এক অটুট ও অসীম জ্ঞানের আধার থেকে রূপ লাভ করেছে, তারই অপর একটি নিদর্শন, যা প্রকৃতির উর্ধ্বে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির অনুগত নয়।

১৩তম পাঠ

কোরান বিকৃতি থেকে মুক্ত

ভূমিকা :

যেমনটি ইতিপূর্বে ইংগিত করা হয়েছে যে, নবুয়্যতের অপরিহার্যতার দলিলের আবেদন হল আল্লাহর বাণীকে সম্পূর্ণ অবিকৃত ও সংরক্ষিত অবস্থায় মানুষের নিকট পৌছানো যাতে এর মাধ্যমে তারা ইহ ও পরকালীন সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে।

অতএব মানুষের নিকট পৌছানো পর্যন্ত, অন্যান্য ঐশীগ্রন্থের মতই অবিকৃত ও সংরক্ষিত ছিল এ ব্যাপারে কোন ি ধা- ন্দ্বের অবকাশ নেই। তবে আমরা জানি যে, অন্যান্য ঐশীগ্রন্থসমূহ মানুষের হস্তগত হওয়ার পর কমবেশী বিচ্যুতি ও বিকৃতির সম্মুখীন হয়েছিল অথবা কালের আবর্তে হারিয়ে গিয়েছিল। যেমন : হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.) এর কিতাবের কোন চিহ্নমাত্র আজ আর আমাদের হাতে নেই এবং হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসার (আ.) কিতাব প্রকৃতরূপে পাওয়া যায় না।

অতএব প্রশ্নের অবকাশ থাকে, আমাদের নিকট এখন ঐশীগ্রন্থ হিসেবে যা বিদ্যমান, কোথা থেকে আমরা জানব যে, এটা ঠিক সেই গ্রন্থই যা স্বয়ং হযরত নবী (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেনি অথবা কোন কিছুই এতে সংযোজন হয়নি কিংবা কোন কিছুই এ থেকে হ্রাস পায়নি ?

তবে যদি কেউ ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান রাখেন অথবা কোরানের সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে মহানবী (সা.) ও তার পবিত্র উত্তরাধিকারীগণের (আ.) প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত থাকেন তদনুরূপ যদি কোরানের আয়াত মুখস্থ করণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে পারেন, (যেমন : শুধুমাত্র এক যুদ্ধেই সত্তর হাজার কোরানের হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন)। অনুরূপ দীর্ঘ চৌদ্দশত বছরে যদি কোরানের বহুল

প্রচারিত হওয়ার কথা এবং আয়াত সংখ্যা, শব্দ ও অক্ষর সংখ্যা ইত্যাদির গণনায় মুসলমানদের অক্লান্ত শ্রম সম্পর্কে ধারণা রেখে থাকেন তবে তিনি কখনোই এ পবিত্র গ্রন্থের ন্যূনতম বিকৃতি ঘটেছে বলে মনে করতে পারেন না। তবে ইতিহাসের এ বিশ্বস্ত সূত্রের সাহায্য ছাড়াও কোরানের পবিত্রতাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদ্ধৃতিগত দলিলের সমষ্টিগত আলোচনার মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ সর্বপ্রথমে কোরানে কোন কিছু সংযোজিত হওয়ার বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে। অতঃপর আমাদের হাতে বিদ্যমান এ কোরান যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে তা প্রমাণিত হওয়ার পর পবিত্র কোরানের আয়াতের মাধ্যমে এ থেকে কোন কিছু হ্রাস বা ঘাটতি না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা যেতে পারে।

অতএব কোন প্রকার বিকৃতি থেকে সম্মানিত গ্রন্থ কোরানের সংরক্ষিত থাকা সম্পর্কে আমরা দু'টি স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা করব।

পবিত্র কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযুক্ত হয়নি :

পবিত্র কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযুক্ত হয়নি, এ ব্যাপারে সকল মুসলমানই একমত। এমনকি বিশ্বের সকল বিজ্ঞজনই এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করেন। এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি, যা কোরানে কোন কিছু সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাব্য উৎস হবে এবং এ ধরনের সম্ভাবনার কোন প্রমাণ নেই। উপর   পবিত্র কোরানে কোন কিছু সংযোজিত হওয়ার বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে নিম্নরূপে অগ্রাহ্য করা যায় :

যদি মনে করা হয় যে, কোন একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় পবিত্র কোরানে সংযোজিত হয়েছে তবে তার অর্থ হল, কোরানের সদৃশ কিছু আনা সম্ভব হয়েছে। আর এ ধরনের ধারণা, কোরানের অলৌকিকতা ও এর সমকক্ষ কিছু করতে মানুষের অপরাগতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেনা। যদি মনে করা হয় যে, শুধুমাত্র এক শব্দ অথবা একটি ক্ষুদ্র আয়াত (যেমন : مدهامّتان) [৯৮] সংযোজিত হয়েছে - যার অপরিহার্য অর্থ হল বক্তব্যের শৃংখলা বিনষ্ট হওয়া ও আলৌকিকতাপূর্ণ প্রকৃতরূপ থেকে বিচ্যুত হওয়া। আর এ রকমটি হলে, তা হবে অনুকরণযোগ্য ও সাদৃশ্য

আনয়নযোগ্য। কারণ কোরানের সুবিন্যস্ত বিষয়বস্তুর অলৌকিকত্ব, শব্দ ও অক্ষরের নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এর ব্যতিক্রম ঘটলে কোরানের অলৌকিকত্ব হারায়।

অতএব যে দলিলের উপর ভিত্তি করে পবিত্র কোরানের অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয়, ঠিক সে দলিলের মাধ্যমেই কোন প্রকারের অতিরিক্ত সংযোজন থেকে সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমনকরে একই দলিলেই শব্দ ও বাক্যের অনুপস্থিতি ঘটার ফলে কোরানের অলৌকিকত্ব বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারটিও নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। তবে একটি পূর্ণ সূরা বা একটি পূর্ণ বিষয়ের ঘাটতি না ঘটার ব্যাপারটি প্রমাণের জন্যে অন্য এক প্রকার দলিলের প্রয়োজন। কারণ এরূপ ঘাটতি, অন্য কোন আয়াতের অলৌকিকত্বের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না।

পবিত্র কোরান থেকে কোন কিছু াস পায়নি :

প্রখ্যাত শিয়া ও সুন্নী আলেমগণ সু ষ্ট ভাষায় গুরুত্বারোপ করেন যে, যেমনিকরে পবিত্র কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযোজিত হয়নি, ঠিক তেমনি এ থেকে কিছুই হ্রাস পায়নি। আর এ বিষয়কে প্রমাণের জন্যে তারা অসংখ্য যুক্তির অবতারণা করেছেন। কি দুঃখের বিষয় হল এই যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাদীসগ্রন্থসমূহে কিছু কিছু প্রতারণাপূর্ণ রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতির ফলে এবং কোন কোন বিশ্বস্ত রেওয়ায়েতের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যার কারণে[৯৯] কেউ কেউ ধারণা করেছেন, এমনকি অনুমোদন দিয়েছেন যে, কোরানের কোন আয়াত বাদ পড়েছে।

তবে যে কোন প্রকারের বিচ্যুতি (হ্রাস বা বৃদ্ধি) থেকে কোরানের মুক্ত থাকার স্বপক্ষে সু ষ্ট ঐতিহাসিক সূত্র ব্যতীত এবং শব্দ বা আয়াতের ঘাটতি কোরানের অলৌককতাপূর্ণ বিন্যাস ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে, মু'জিযাহর দলিলের মাধ্যমে তা অগ্রাহ্য হওয়া ছাড়াও কোন আয়াত বা পূর্ণাঙ্গ সূরার ঘটতি থেকে কোরান সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি স্বয়ং পবিত্র কোরানের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যেতে পারে।

অর্থাৎ বিদ্যমান সমস্ত কোরান আল্লাহর কালাম এবং কোন কিছুই এতে সংযোজিত হয়নি এ বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পর, এর আয়াতসমূহকে দৃঢ়তম উদ্ধৃতিগত বিশ্বাসগত ও চূড়ান্ত দলিল

রূপে উপস্থাপন করা যায়। কোরানের এরূপ একটি আয়াত থেকে আমার জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ যেকোন প্রকার বিচ্যুতি থেকে এ কোরানকে সংরক্ষণ করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যা অন্যান্য ঐশীগ্রন্থসমূহের ব্যতিক্রম। কারণ ঐ গুলোর সংরক্ষণের দায়িত্ব মানব সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করেছিলেন। যেমন : ইহুদী ও নাসারাদের আলেমদের ব্যাপারে পবিত্র কোরানে এসেছে –

(بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ)

কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। (সূরা মায়িদাহ - ৪৪)

উল্লেখিত বিষয়টি কোরানের নিম্নলিখিত আয়াত থেকে অনুধাবন করা যায় :

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)

আমরাই কোরান অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই উহার রক্ষক। (সূরা হিজর- ৯)

এ আয়াতটি দু'টি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। প্রথম বাক্যটিতে " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ " অর্থাৎ নিশ্চয় আমরাই এ কোরান নাযিল করেছি - এর মাধ্যমে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে এবং অবতীর্ণ হওয়ার সময় এতে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটেনি। অপর বাক্যে যথা : وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ''এবং নিশ্চয় আমরাই একে সংরক্ষণ করব'' - এর মাধ্যমে এবং গুরুত্ব প্রদানকারী প্রত্যয়সমূহ ও বাক্যের গঠনে এর অবিরত অবস্থার উপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে, যে কোন প্রকার বিকৃতির হাত থেকে কোরানের সার্বক্ষণিক সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

বর্ণিত আয়াতটি কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযোজিত না হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলেও এ ধরনের বিকৃতিকে নিষিদ্ধকরণের জন্যে এ যুক্তির অবতারণা এক ধরনের আবর্তন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ কোরানে কোন কিছু সংযোজিত হওয়ার ধারণা এ আয়াতটিকেও সমন্বিত করে। ফলে এ ধরনের ধারণাকে স্বয়ং ঐ আয়াতের মাধ্যমে অগ্রাহ্য করা সঠিক হতে

পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ঐ ধারণাকে কোরানের অলৌকিকত্বের দলিলের মাধ্যমে বর্জন করেছিলাম । অতঃপর এ আয়াতটির মাধ্যমে আয়াত বা পূর্ণ সূরার ঘাটতি লাভ (এমনরূপে যে, এর অলৌকিকত্বপূর্ণ বিন্যাস ব্যবস্থার কোন ক্ষতি হয়না) থেকে সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারটিও প্রতিপাদন করেছিলাম। আর এভাবেই হ্রাস বা বৃদ্ধির মত যে কোন প্রকার বিকৃতি থেকে পবিত্র কোরানের সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদ্ধৃতিগত দলিলের সমন্বয়ে প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে এ বিষয়টি স্মরণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি যে, সকল প্রকারের বিকৃতি থেকে কোরান সংরক্ষিত থাকার অর্থ এ নয় যে, যেখানেই কোরান নামে কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে, তা- ই পূর্ণ কোরান হবে এবং মুদ্রণজনিত ও সূত্রগত সকল প্রকার ত্রুটির উর্ধ্বে থাকবে অথবা এর কোন প্রকারের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যগত ত্রুটি অসম্ভব কিংবা এর আয়াত ও সূরাসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার ক্রমানুসারে সজ্জিত হয়েছে। বরং এর অর্থ হল এই যে, কোরান মানুষের নিকট এরূপে বিদ্যমান থাকবে যে, সত্যানুসন্ধিৎসুগণ সকল আয়াতসমূহকেই এমনরূপে পাবে, ঠিক যে রূপে অবতীর্ণ হয়েছে।

অতএব এ কোরানের কোন কোন খণ্ডের অসম্পূর্ণতা ও অশুদ্ধি অথবা পঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা কিংবা অবতীর্ণ হওয়ার ক্রমিকতার ব্যতিক্রমে আয়াত ও সূরাসমূহের পুনর্বিন্যাস অথবা তাৎপর্যগত বিকৃতি ও বিচিত্র প্রকারের তাফসির বা ব্যাখ্যার উপস্থিতি, পূর্ববর্ণিত বিকৃতি থেকে কোরানের সংরক্ষিত থাকার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না।

১৪তম পাঠ

ইসলামের সার্বজনীনতা ও চিরন্তনতা

ভূমিকা :

আমরা জেনেছি যে, সকল নবীর (আ.) উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদের বক্তব্যসমূহকে গ্রহণ করা অপরিহার্য (ি তীয় খণ্ড পাঠ- ৯)। অনুরূপ কোন এক নবীকে অস্বীকার করা অথবা তার কোন একটি হুকুমকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহর বিধিগত প্রতিপালনকে অস্বীকার করা ও ইবলিসের মতই অবাধ্য হওয়ার শামিল।

অতএব ইসলামের নবী (সা.) এর রিসালাতকে প্রতিপাদন করার পর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তার প্রতি অবতীর্ণ সকল আয়াতের প্রতি ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আনিত সকল বিধি-নিষেধের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য ।

কি   সকল নবী (আ.) ও ঐশী গ্রন্থসমূহের উপর বিশ্বাস করার ফলে সকল শরীয়তানুসারে কর্ম সম্পাদন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে না। যেমন : মুসলমানরা সকল উলুল আজম (আ.) ও সকল ঐশীকিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। কি   পূর্ববর্তী শরীয়তানুসারে কার্য সম্পাদন করতে পারে না বা করা নিষিদ্ধ। ইতিপূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি যে, সকলকেই তাদের সংশ্লিষ্ট নবীর আদেশানুসারে কর্ম সম্পাদন করতে হবে (ি তীয় খণ্ড পাঠ- ৯) ।

অতএব সকল মানুষের জন্যে ইসলামের শরীয়তের অনুসরণ তখনই অপরিহার্য হবে, যখন ইসলামের নবীর (সা.) রিসালাত কোন নির্দিষ্ট গোত্রের বা জাতির (যেমন : আরব) জন্যে নির্ধারিত না হবে এবং তদনুরূপ যখন তার পরে অন্য কোন নবীর আবির্ভাব না ঘটে, যার ফলে তার শরীয়ত রহিত হবে কিংবা অন্য কথায় : যখন ইসলাম সার্বজনীন ও চিরন্তন ধর্ম হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টিকে আলোচনার বিষয়রূপে বিবেচনা করা অপরিহার্য যে, ইসলামের নবী (সা.) এর রিসালাত কি সার্বজনীন ও চিরন্তন, নাকি কোন নির্দিষ্ট গোত্র ও কালের জন্যে সীমাবদ্ধ ?

এটা সু ষ্ট যে, এ ধরনের কোন বিষয়কে নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা যায় না। বরং উদ্ধৃতিগত ও ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর গবেষণা পদ্ধতির সাহায্য নেয়া উচিৎ । অর্থাৎ বিশ্বস্ত কোন সূত্র ও সনদের শরণাপন্ন হতে হবে। যদি কেউ পবিত্র কোরানের সত্যতা কিংবা ইসলামের নবীর (সা.) নবুয়্যত ও ইসমাত সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে, তবে তার জন্যে কিতাব ও সুন্নতের চেয়ে বিশ্বস্ত কোন সনদ থাকতে পারেনা।

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম :

ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম এবং কোন নির্দিষ্ট গোত্র ও স্থানের জন্যে নির্ধারিত না থাকা, এ ঐশী ধর্মের অপরিহার্য শর্ত। এমনকি যারা এ ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেনি তারাও জানে যে, ইসলামের আহ্বান হল সার্বজনীন এবং কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়।

এছাড়া এটা ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত যে, মহানবী (সা.) বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান যেমন : রোমের কাইসার, ইরানের বাদশাহ, মিশর, ইথিওপিয়া, সিরিয়ার অধিপতিগণ এবং তদনুরূপ আরবের বিভিন্ন গোত্রপতি ও অন্যান্যদের নিকট পত্র লিখেছিলেন। তাদের নিকট বিশেষ দূত প্রেরণ করেছেন এবং সর্বসাধারণকে এ পবিত্র ীনের ছায়ায় আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সাথে এ ীনকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।[১০০] আর যদি ইসলাম বিশ্বজনীন না হত তবে এ ধরনের উদাত্ত আহবান জানাতেন না এবং তখন অন্যান্য জাতি ও গোত্রের জন্যে এ ীনকে গ্রহণ না করার যথেষ্ট অজুহাতের অবকাশ থাকত।

অতএব ইসলামের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও এ শরীয়তানুসারে কার্য সম্পাদনের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা যায় না। ফলে কাউকেই এ ীনের অনুসরণের দায়িত্ব থেকে ব্যতিক্রম মনে করা সম্ভব নয়।

ইসলামের সার্বজনীনতার স্বপক্ষে কোরানের দলিল :

যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ধরনের বিষয়সমূহকে প্রমাণের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও বিশ্বস্ত সনদ হল কোরান, যার বিশ্বস্ততা ও সত্যতা পূর্ববর্তী পাঠসমূহে সু   ষ্টরূপে আলোচনা করা হয়েছে। যদি কেউ এ ঐশী গ্রন্থটি মোটামুটি একবার পাঠ করে থাকেন তবে দেখতে পাবেন যে, এর আহ্বান সর্বসাধারণ ও সার্বজনীন এবং বিশেষ কোন গোত্র, জাতি ও ভাষার জন্যে নির্ধারিত নয়।

বিশেষ করে অধিকাংশ আয়াতেই সকল মানুষকে يا ايها الناس অর্থাৎ হে মানুষ ও[১০১] يا بنى ادم হে আদম সন্তান[১০২]; রূপে সমোধন করা হয়েছে এবং সকল মানুষকে (الناس [১০৩]এবং العلمين [১০৪])এ হিদায়াতের পথে আহ্বান জানিয়েছে। অনুরূপ অনেক আয়াতে মহানবী (সা.) এর রিসালাতকে সকল মানুষের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে (الناس [১০৫]এবং العلمين [১০৬]) এবং এ রকমই একটি আয়াতে তার আহ্বান, যে কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে তার জন্যে প্রযোজ্য হবে বলে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[১০৭] অপরদিকে অন্যান্য ীনের অনুসারীদেরকে আহলুলকিতাব (اهل الكتاب) বলে সম্বোধন ও ভর্ৎসনা করেছেন[১০৮] এবং মহানবীর (সা.) রিসালাতকে তাদের উপর সুস্থিত করেছেন। আর সেই সাথে অন্যান্য ীনের উপর ইসলামের বিজয়কে পবিত্র কোরান অবতীর্ণ করার মূল উদ্দেশ্যরূপে বিবেচনা করেছেন।[১০৯]

অতএব এ আয়াতসমষ্টির আলোকে, কোরানের আহ্বানের সার্বজনীনতা ও পবিত্র ীন ইসলামের বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে কোন িধা- ন্দ্বের অবকাশ থাকতে পারে না।

ইসলামের চিরন্তনতা :

উল্লেখিত আয়াতসমূহ সাধারণ শব্দসমষ্টি (যেমন : বনি আদম, নাস ও আলামিন) এবং অনারব ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে (যেমন : ইয়া আহলাল কিতাব) আহ্বানের মাধ্যমে, ইসলামের সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতার প্রমাণ বহন করে। তদনুরূপ কালের সীমাবদ্ধতাকে দূরীকরণের

মাধ্যমে কোন নিদিষ্ট সময়ের শর্তের আওতাবহির্ভূত করা হয়েছে। বিশেষ করে 'ليظهر على الدين كله' অর্থাৎ সমস্ত ীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্যে[১১০] - এ বক্তব্যটির পর আর কোন প্রকার িধার অবকাশ থাকে না। এ ছাড়া নিম্নলিখিত আয়াতটির মাধ্যমে যুক্তি প্রদান করা যেতে পারে :

(وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)

নিশ্চয় এটা এক সম্মানিত গ্রন্থ, অগ্র ও পশ্চাৎ কোন মিথ্যাই এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। এটা' প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ। (ফুসসিলাত- ৪২)

এ আয়াতটি এ যুক্তির অবতারণা করে যে, পবিত্র কোরান কখনোই তার নির্ভুলতা ও বিশ্বস্ততা হারাবে না। অপরদিকে মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে নবুয়্যতের ধারার সমাপ্তির (যা অন্য একটি পাঠে আলোচনা করা হবে) দলিলের উপস্থিতিতে অন্য কোন নবী ও শরীয়তের মাধ্যমে এ ঐশী ীনের রহিতকরণের সকল সম্ভাবনা পরিত্যাক্ত হয়। অনুরূপ এ বিষয়ের উপর অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক যার বৈধতা প্রদত্ত হয়েছে তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বৈধ, আর যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে।[১১১]

তদুপরি বিশ্বজনীনতার মতই ইসলামের চিরন্তনতাও এ ঐশী ীনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, যা ইসলামের সত্যতার প্রমাণের অধিক কোন দলিলের আবেদন করে না।

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন :

ইসলামের শত্রুরা, যারা এ ঐশী ীনের বিস্তার রোধ করতে বদ্ধপরিকর, তারা কোন প্রকার নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনেই পিছ পা হয়নি বা হবে না। যা হোক এখন তারা এ ভ্রান্ত ধারণা প্রচারে প্রয়াসী

হয়েছে যে, ইসলাম শুধুমাত্র আরবদের জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্যান্য জনসমষ্টির জন্যে কোন প্রকার রিসালাত নিয়ে আসেনি !

বিশেষ করে এ আয়াতসমূহকে তারা ব্যবহার করেছেন যে, মহানবীকে (সা.) নিজ আত্মীয়-স্বজন অথবা মক্কাবাসী ও মক্কার আশেপাশের লোকজনকে হিদায়াত করণের জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছিল।[১১২] অনুরূপ সূরা মায়িদাহর ৬৯ নং আয়াতটিতে ইহুদী, সাবেঈন ও ীষ্টানদের প্রতি ইঙ্গিত করণের পর সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতিস্বরূপ ঈমান ও সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কি   সৌভাগ্যের শর্তরূপে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মত কোন নামই স্মরণ করা হয়নি। এ ছাড়া ইসলামের ফিকাহশাস্ত্রে আহলে কিতাব ও মুশরিকরা একই স্তরে নয়। বরং জিযিয়াহ কর (খুমস ও যাকাত, যা মুলসলমানরা প্রদান করে তা ব্যতীত) প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী সরকারের শাসন ব্যবস্থায় তারা (আহলে কিতাব) নিরাপত্তা লাভ করতঃ স্বীয় শরীয়তানুসারে কার্য সম্পাদন করতে পারে, যা এ সকল ধর্মের স্বীকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

জবাব : ঐ সকল আয়াত, যেগুলোতে মহানবী (সা.) এর আত্মীয়- স্বজনকে ও মক্কাবাসীদেরকে আহ্বানের কথা স্মরণ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাতে দাওয়াতের পর্যায়সমূহকে বর্ণনা করা হয়েছে, যা তার স্বজন ও পরিজন থেকে শুরু করে মক্কা ও এর আশে- পাশের অন্যান্য জনগণ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং সর্বশেষে সমস্ত বিশ্ববাসীর ারপ্রান্তে পৌছবে। আর এ ধরনের আয়াতকে ঐ সকল আয়াতের সীমাবদ্ধকারী হিসেবে মনে করা যায় না, যেগুলোতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতের বিশ্বজনীনতা ফুটে উঠেছে। কারণ এ সকল আয়াতের বাচনভঙ্গি সীমাবদ্ধ করণের পরিপন্থী হওয়া ছাড়াও উল্লেখিত শর্তের অপরিহার্য ফলশ্রুতি হল অধিকাংশের সীমাবদ্ধকরণ (تخصيص الاكثر) যা বিজ্ঞসমাজে অশিষ্ট ও অগ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য।

অপরদিকে সূরা মায়িদাহর উল্লেখিত আয়তটি এ বিষয়ের বর্ণনা করে যে, প্রকৃত কল্যাণ লাভের জন্যে কেবলমাত্র এ ধর্ম বা ঐ ধর্মের অনুসারী হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং কল্যাণের চাবিকাঠি হল প্রকৃত বিশ্বাস এবং ঐ সকল কর্ম সম্পাদন, যেগুলো মহান আল্লাহ তার বান্দাগণের জন্যে নির্ধারণ করেছেন। তদুপরি ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতার প্রমাণবহ দলিলানুসারে ইসলামের

নবীর (সা.) আবির্ভাবোত্তরে প্রত্যেক মানুষের নৈতিক দায়িত্ব হল এ ীনের হুকুম- আহকামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

যা হোক ইসলামে অন্যান্য কাফেরদের উপর আহলে কিতাবদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তার অর্থ ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ ও এর আহকাম অনুসারে কার্য সম্পানের বাধ্যবাধকতা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া নয়। বরং ভব্যতাহেতু তাদের অধিকার রক্ষা করা হয়েছে বৈ কি। তবে শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মতে এ সুযোগটুকুও সাময়িক এবং ইমাম মাহদীর (আ.) (মহান আল্লাহ তার আবির্ভাবকে তরান্বিত করুন) আবির্ভাবের পর তিনি তাদের জন্যে চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করবেন। আর তখন আহলে কিতাবদের সাথে ও অন্যান্য কাফেরদের মতই আচরণ করা হবে, যা আমরা নিম্নলিখিত আয়াতটি থেকে অনুধাবন করতে পারি ।

(لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)

(ইসলামকে) সমস্ত ীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্যে। (তওবাহ- ৩৩)

১৫তম পাঠ

নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি

ভূমিকা :

ইসলামের সার্বজনীনতার ভিত্তিতে এর রহিতকারী কোন নবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। কি এ ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ থাকে যে, অন্য এক নবী ইসলামের প্রচারক রূপে আবির্ভূত হবেন। যেমন : পূর্ববর্তী অনেক নবীই এ ধরনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নবী শরীয়তের অধিকারী পয়গাম্বরগণের সমসায়িক ছিলেন। যেমন : হযরত লুত (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.)- এর সমসাময়িক এবং তার শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। আবার অন্য এক শ্রেণীর নবী ছিলেন, যারা শরীয়তের অধিকারী নবীগণের পরে আবির্ভূত হয়ে পূর্ববর্তী নবীর শয়ীয়তের অনুসরণ করেছিলেন। যেমন : বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী- ই এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের নবী (সা.)- এর মাধ্যমে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির বিষয়টিকে স্বতন্ত্ররূপে আলোচনা করব, যাতে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার কোন অবকাশ না থাকে ।

নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তির স্বপক্ষে কোরানের দলিল :

ইসলামের পরম বিশ্বাসসমূহের মধ্যে একটি হল এই যে, নবুয়্যতের ধারা ইসলামের নবী (সা.)- এর সাথে যবনিকারেখা টেনেছে এবং তার পরে আর কোন নবী অসেননি বা আসবেও না। এমন কি বিধর্মীরাও জানে যে, এ বিষয়টি ইসলামের বিশ্বাসসমূহের অন্তর্গত এবং সংগত কারণেই প্রত্যেক মুসলমানকে এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে। দ্বীনের অন্যান্য অপরিহার্য বিশ্বাসসমূহের মতই এর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। তদুপরি এ বিষয়টিকে একদিকে যেমন পবিত্র কোরানের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়, অপরদিকে তেমনি বহুল প্রচারিত বা মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমেও

প্রমাণ করা যায়। পবিত্র কোরানে সূ ষ্ট ভাষায় হযরত (সা.) কে সর্বশেষ নবীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। (আহযাব - ৪০)

ইসলামের শত্রুদের মধ্যে কেউ কেউ মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে এ আয়াতের দলিলত্ব সম্পর্কে দু'টি সমস্যার উল্লেখ করে থাকে : একটি হল 'خاتم' (খাতাম) শব্দটি আংটি অর্থেও ব্যব ত হয়েছে এবং সম্ভবতঃ এ আয়াতটিতেও এ অর্থেই (আংটি) স্থান পেয়েছে। অপরটি হল خاتم (খাতাম) সে সর্বজনস্বীকৃত অর্থেই ব্যব ত হয়েছে মনে করলে আয়াতের ভাবার্থ এই যে, (কেবলমাত্র) নবীগণের ধারাই হযরত (সা.) এর মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়েছে - রাসূলগণের ধারা নয়।

যা হোক প্রথম সমস্যাটির জবাব এই যে, خاتم(খাতাম) অর্থ সমাপ্ত করার মাধ্যম مايختم به الشيئ অর্থাৎ যার মাধ্যমে কোন কিছু সমাপ্ত করা হয় এবং আংটিও এ অর্থেই আংটি নামকরণ হয়েছে। কারণ (পূর্বে) পত্র এবং পত্রজাতীয় বিষয়সমূহের যবনিকা টানা হত আংটির মাধ্যমে মোহরাংকিত করে।

িতীয় সমস্যাটির জবাব এরূপ : সকল রিসালাতের অধিকারী পয়গাম্বরই নবুয়্যতের মর্যাদায়ও অভিষিক্ত এবং নবীগণের ধারার পরিসমাপ্তির মাধ্যমে রাসূলগণের ধারারও পরিসমাপ্তি ঘটে। যেমনটি ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে[১১৩] যে, নবী (نبى) অভিধাটি রাসূল (رسول) অভিধাটির চেয়ে ব্যাপক না হলে ও বিষয় বিশেষে নবী (نبى) পরিভাষার বিস্তৃতি রাসূল (رسول) পরিভাষাটির চেয়ে বিস্তৃততর।

নবুয়্যাতের ধারার পরিসমা ি র স্বপক্ষে হাদীসের দলিলাদি :

ইসলামের নবী (সা.) এর মাধ্যমে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির স্বপক্ষে শতশত হাদীস সু ষ্ট ও গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'হাদীসে মানযিলাত' এ হাদীসটি শিয়া এবং সুন্নী উভয় উৎস থেকেই বহুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটির বিষয়বস্তু তে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। নিম্নে 'হাদীসে মানযিলাতটি' বর্ণিত হল :

যখন ইসলামের নবী (সা.) মদীনা থেকে তাবুকের যুদ্ধে যাত্রা করলেন তখন আমীরুল মু'মিনিন আলীকে (আ.) মুসলমানদের দায়িত্ব প্রদান করে স্বীয় স্থানে নিয়োগ দিয়েছিলেন। হযরত আলী (আ.) এ জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবেন বলে কিছুটা দুঃখিত হলেন এবং তার আঁখিযুগল থেকে পবিত্র অশ্রুরাশি গড়িয়ে পড়ল । ফলে মহানবী (সা.) তাকে বললেন :

اما ترضی ان تکون بمنزلة هارون من موسی الا انّه لا نبی بعدی

তুমি কি এতে তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সে সম্পর্ক হোক, যে সম্পর্ক ছিল হারুনের সাথে মুসার ? কোন প্রকার বিরতি না দিয়েই বললেন : তবে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না।

ফলে ি ধা- ন্দ্বের কোন অবকাশ থাকে না। অপর একটি হাদীসটিতে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে –

ایها الناس انّه لا نبی بعدی و لا امّة بعدکم

হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমার পরে কোন নবী আসবে না এবং তোমাদের পরে কোন উম্মতও আসবে না।[১১৪]

অনুরূপ অপর একটি হাদীসে হযরত (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

ایّها الناس انّه لا نبیّ بعدی و لا سنّة بعد سنّتی

হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমার পর আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না এবং আমার সুন্নতের পর আর কোন সুন্নত নেই ।[১১৫]

এছাড়া, ‘নাহজুল বালাগাহর ’ বেশ কয়েকটি খুতবায়[১১৬] এবং পবিত্র ইমামগণ (আ.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত, দোয়াসমূহ ও যিয়ারতেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যেগুলোর উদ্ধৃতি দিলে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে।

নবুয়্যতের ধারার পরিসমা ি র প্রকৃত রহস্য :

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম[১১৭] যে, নবীগণের একাধিক্য ও পূর্ববর্তী সময়ে পরম্পরায় আবির্ভাবের যথাযথ কারণ হল : একদিকে পৃথিবীর সর্বত্র ও সকল জনসমষ্টির নিকট ঐশী রিসালাতের প্রচার, এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরদিকে নবীন সমাজের উদ্ভব, সম্পর্কের জটিলতা ও বিস্তৃতি, নতুন নিয়মের উদ্ভব অথবা পূর্ববর্তী নিয়মের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। অপরপকক্ষে কালের আবর্তে অথবা অজ্ঞতা ও ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির স্বার্থ রক্ষার্থে যে বিকৃতি ও বিচ্যুতি সাধিত হয়েছে, তাতে অন্য এক নবী প্রেরণের মাধ্যমে ঐশী শিক্ষার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করণের প্রয়োজনীয়তা।

অতএব যদি পৃথিবীর সর্বত্র ঐশী রিসালাতের প্রচার একজন নবী এবং তার সহচর ও উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে সম্ভব হয় অথবা এক শরীয়তের আহকাম ও কানুন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সমাজের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয় কিংবা উক্ত শরীয়তে নতুন কোন সমস্যা সম্পর্কে ভবিষ্য াণী বিদ্যমান থাকে, তদনুরূপ কোন প্রকার বিকৃতি থেকে উক্ত শরীয়তের সংরক্ষিত থাকা ও অবিস্মৃত থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তবে অন্য কোন নবীর আবির্ভাবের কোন কারণ থাকবে না।

তবে মানুষের সাধারণ জ্ঞান এ ধরনের শর্তসমূহকে চিহ্নিত করতে অপারগ এবং একমাত্র মহান আল্লাহই স্বীয় অসীম জ্ঞানের মাধ্যমে এ শর্তসমূহের বাস্তবায়ন কাল সম্পর্কে অবহিত আছেন। তিনিই পারেন নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির ঘোষণা দিতে। আর এ কর্মটিই তিনি সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থে সম্পাদন করেছেন।

কি নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তি মানে আল্লাহর সাথে তার বান্দাগণের হিদায়াতের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া নয়। বরং যখনই মহান আল্লাহ প্রয়োজন মনে করবেন তার যোগ্য বান্দাগণকে অদৃশ্যের জ্ঞান প্রদান করতে পারবেন - যদিও তা নবুয়্যতের ওহী না হয় । যেমন : শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, এ ধরনের জ্ঞান মহান আল্লাহ পবিত্র ইমামগণকে (আ.) দান করেছেন। মহান আল্লাহর কৃপায় পরবর্তী পাঠসমূহে ইমামত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

একটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমারা অবগত হয়েছি যে, নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির গুঢ় রহস্য হল : প্রথমতঃ ইসলামের মহানবী (সা.) তার সহচর ও উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে স্বীয় রিসালাতের আহ্বান সমগ্র বিশ্ববাসীর কর্ণে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। ি তীয়তঃ সকল প্রকার বিকৃতি থেকে তাকে প্রদত্ত ঐশী গ্রন্থের সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে এবং তৃতীয়তঃ ইসলামের শরীয়ত এ জগতের শেষাবধি মানুষের সকল প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।

কি কেউ হয়ত শেষোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে এরূপে সমস্যা উত্থাপন করতে পারেন যে, যেমনিকরে পূর্ববর্তী সময়গুলোতে সামাজিক সম্পর্কের জটিলতার কারণে নতুন আহকাম প্রণয়নের ও পূর্ববর্তী আহকামের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে অন্য এক নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি ইসলামের নবী (সা.) এর পরও সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে ও সামাজিক সম্পর্ক আরও জটিলতর হয়েছে। সুতরাং আমরা কোথা থেকে নিশ্চিত হব যে, এ ধরনের পরিবর্তন নতুন কোন শরীয়তের দাবি করেনি ?

জবাব : যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিরূপ পরিবর্তন মূল নিয়মের পরিবর্তনের আবেদন করে, তা চিহ্নিত করা সাধারণ মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কর্ম। কারণ আহকাম ও নিয়মের দর্শনের উপর আমাদের পূর্ণ জ্ঞান নেই। বরং ইসলামের চিরন্তনতা ও মহানবী (সা.) এর খাতামিয়্যাতের দলিল থেকে উদঘাটন করতে পারি যে, ইসলামের মূল নিয়মের পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই।

তবে আমরা সামাজিক কোন কোন নতুন বিষয়ের প্রেক্ষাপটে নতুন কোন শর্তের আবেদন থাকতে পারে তা অস্বীকার করি না। কি ইসলামের শরীয়তে এ ধরনের আংশিক নিয়ম প্রণয়নের জন্যে মূলনীতি ও পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে যাতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ঐ মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রণয়ন করতঃ তা সমাজে প্রচলন করতে পারেন। এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রে বর্ণিত 'ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধিকার' (পবিত্র ইমাম ও ওয়ালীয়ে ফকীহ্) নামক আলোচ্য বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।

১৬তম পাঠ

ইমামত

ভূমিকা :

মহানবী (সা.) এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর এ শহরের জনগণের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন (যার ফলে সম্মানার্থে আনসার নামে ভূষিত হয়েছিলন) এবং মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের (মুহাজির) নিয়ে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আর মাসজিদুন্নাবী একদিকে যেমন উপসনালয় ও ঐশী রিসালাতের প্রচার, প্রশিক্ষণ ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার কেন্দ্র ছিল। অপরদিকে তেমনি মুহাজির ও সমাজের বঞ্চিত, নিগৃহীত মানুষের আশ্রয়স্থলও ছিল। এ মসজিদেই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও জীবিকা নির্বাহের কর্মসূচী নেয়া হত। এখানেই বিচার- বিবাদের মীমাংসা এবং সামরিক সিদ্ধান্ত, যুদ্ধের জন্যে সৈন্য প্রেরণ, যুদ্ধের পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। মোটকথা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব সকল বিষয় মহানবী (সা.)- এর মাধ্যমেই পরিচালিত হত। মুসলমনরাও হযরত (সা.)- এর আদেশের আজ্ঞাবহ হওয়াটা নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব মনে করতেন। কারণ মহান আল্লাহ রাজনৈতিক বিচার ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হযরত (সা.)- এর নিঃশর্ত আনুগত্য করার আদেশ প্রদান[১১৮] ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহেও তার আজ্ঞাবহ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[১১৯]

অন্য কথায় : মহানবী (সা.) নবুয়্যত, রিসালাত এবং ইসলামের আহকাম প্রচার ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছাড়াও ইসলামী সমাজের নেতৃত্বের দয়িত্বে ও নিয়োজিত ছিলেন। বিচারকার্য ও সামরিক নেতৃত্ব ইত্যাদি এ থেকেই উৎকলিত হত। যেমনিকরে ইসলামে ইবাদত ও আচরণগত দায়িত্ব ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অধিকারগত ইত্যাদি কর্তব্যও বিদ্যমান, তেমনিকরে ইসলামের নবী (সা.) প্রচার, প্রশিক্ষণ ও (আধ্যত্মিক) পরিচর্যার দায়িত্ব ছাড়াও মহান আল্লাহর

নিকট থেকে ঐশী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সকল প্রকার প্রশাসনিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

এটা অনস্বীকার্য যে, যদি কোন ীন বিশ্বের শেষাবধি সকল প্রকার সামাজিক কর্তব্য পালনের দাবি করে তবে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। অনুরূপ যে সমাজ এ ীনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সমাজ এ ধরনের কোন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তব্য থেকে নিরুদ্দিষ্ট থাকবে, যা ইমামত নামে অভিষিক্ত, তাও হতে পারে না।

কি কথা হল মহানবী (সা.) এর তিরোধানের পর, কে এ দায়িত্ব লাভ করবেন ? এবং তা কার কাছ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন ? মহান আল্লাহ এ মর্যাদা যেরূপে মহানবীকে (সা.) দিয়েছিলেন সেরূপে অন্য কাউকেও কি দিয়েছেন? এ দায়িত্বভার অন্য কারও গ্রহণের কোন বৈধতা রয়েছে কি ? নাকি মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এ মর্যাদা মহানবী (সা.)- এর জন্যেই নির্ধারিত ছিল এবং অতঃপর মুসলিম জনতাই তাদের ইমাম নির্বাচন করবে ও তাকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্থান দিবে, তা- ও বিধিসম্মত ? মানুষের কি এ ধরনের কোন অধিকার আছে ? না নেই ?

আর এটিই হল শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল বিরোধের বিষয়। অর্থাৎ একদিকে শিয়াদের বিশ্বাস যে ইমামত হল একটি ঐশী মর্যাদা, যা মহান আল্লাহ কর্তৃকই যথোপযুক্ত ও যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা আবশ্যক। আর মহান আল্লাহ, মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে এ কর্মটি সম্পাদন করেছেন এবং আমীরুল মু'মিনিন আলীকে (আ.) তার উত্তরাধিকারী ঘোষনা করেছেন। অতঃপর তারই সন্তানদের মধ্য থেকে পরম্পরায় বারজনকে ইমামতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করছেন। অপরদিকে সুন্নি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, ইমামত নবী (সা.)- এর তিরোধানের সাথে সাথে নবুয়্যত ও রিসালাতের মতই যবনিকায় পৌছেছে এবং এর পর থেকে ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এমনকি আহলে সুন্নাতের কোন কোন বিজ্ঞজন সু ষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যদি কেউ অস্ত্রের ভয় দেখিয়েও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তবে তার আনুগত্য করাও অন্যান্যদের জন্যে অপরিহার্য।[১২০] ষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি

স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও প্রতারকদের অপরাধের জন্যে কতটা পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং মুসলমানদের অবক্ষয় ও বিভেদের পথে কতটা সহায়ক হয়েছে!

প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাত ঐশী সম্পর্কহীন ইমামতের বৈধতা দিয়ে রাজনীতি থেকে ধর্মের পৃথকীকরণের প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন। আর শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, এটিই হচ্ছে ইসলামের সঠিক ও সত্য সুন্দর পথ থেকে এবং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুতির মূল কারণ। অনুরূপ শতসহস্র ধরনের বিচ্যুতি ও বিপথগামিতার সূতিকাগারও এখানেই, যেগুলো মহানবী (সা.) এর পরলোক গমনের পর থেকে মুসলমানদের মাঝে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং করবে।

অতএব প্রতিটি মুসলমানের জন্যেই কোন প্রকার অন্ধ অনুকরণ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যতিরেকে এ বিষয়টির উপর পরিপূর্ণ গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো অপরিহার্য।[১২১] আর সেই সাথে সত্য ও সঠিক মাযহাবের শনাক্তকরণের মাধ্যমে এর প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিৎ।

উল্লেখ্য এ ব্যাপোরে ইসলামী বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে ইসলামের শত্রুদের জন্যে সুযোগ করে দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এমন কোন কাজ করা যাবে না যা ইসলামী সমাজে ফাটল সৃষ্টি করবে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে নিজেদের পার রিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বিনষ্ট হবে। আর এ ক্ষতির অংশীদার মুসলমানরাই হবে, যার ফলশ্রুতি মুসলিম সমাজব্যবস্থার দুর্বলতা বৃদ্ধি ব্যতীত কিছই নয়। কি মুসলমানদের পার রিক সহযোগিতা ও ঐক্য সংরক্ষণ যেন, সঠিক ও সত্য মাযহাবের অনুসন্ধান ও শনাক্তকরণের জন্যে, অনুসন্ধান ও গবেষনার সুষ্ঠ পথকে রুদ্ধ না করে ফেলে। আর ইমামতের বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুষ্ঠ পরিবেশ যেন ব্যাহত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ বিষয়গুলোর সঠিক সমাধানের উপর মুসলমানদের ভাগ্য এবং ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ নির্ভর করে।

ইমামতের তাৎপর্য :

ইমামতের আভিধানিক অর্থ হল নেতা, পথপ্রদর্শক এবং যে কেউ কোন জনসমষ্টির নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহন করবে তাকেই ইমাম (امام) বলা হয়ে থাকে - হোক সে সত্য পথের অনুসারী কিংবা মিথ্যা পথের অনুসারী। যেমন : পবিত্র কোরানে কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকদের সম্পর্কে (ائمة الكفر) অর্থাৎ কাফেরদের নেতারা (সূরা তওবাহ- ১২) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। তদনুরূপ মুসল্লীরা নামাজের জন্যে যার পিছনে সমবেত হয়ে থাকেন, তাকে 'ইমামুল জামা'ত' নামকরণ করা হয়। কি কালামশাস্ত্রের পরিভাষায় ইমামত হল ইহ ও পরলৌকিক সকল বিষয়ে ইসলামী সমাজের সর্বময় ও বিস্তৃত নেতৃত্ব প্রদান। ইহলৌকিক শব্দটি ইমামতের পরিসীমার ব্যাপকতা বুঝাতে ব্যব ত হয়েছে। নতুবা ইসলামী সমাজে ইহলৌকিক বিষয়াদিও ীন ইসলামেরই অন্তর্ভুক্ত।

শিয়া সম্প্রদায়ের মতে এ ধরনের নেতৃত্ব কেবলমাত্র তখনই বৈধ হবে, যখন তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত হবে। আর প্রকৃতপক্ষে (সহকারী হিসেবে নয়) যিনি এ মর্যাদার অধিকারী হবেন, তিনি আহকাম ও ইসলাম পরিচিতির বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত থাকবেন। অনুরূপ তিনি সকল প্রকার গুনাহতে লিপ্ত হওয়া থেকে পবিত্র থাকবেন। বস্তুতঃ পবিত্র ইমাম, একমাত্র নবুয়্যত ও রিসালাত ব্যতীত মহানবীকে (সা.), মহান আল্লাহ প্রদত্ত সকল মর্যাদার অধিকারী হবেন। ইসলামের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন বর্ণনার ক্ষেত্রে তার বক্তব্য যেমন নিঃশর্তভাবে গ্রহণযোগ্য, তেমনি প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়েও তার আদেশ পালন করাও অপরিহার্য।

এভাবে শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের মধ্যে ইমামতের ক্ষেত্রে তিনটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় :

প্রথমতঃ ইমামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত হতে হবে।

িতীয়তঃ ইমামকে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং সকল প্রকার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

তৃতীয়ত : ইমামকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র থাকতে হবে ।

তবে মা'সুম হওয়াটা ইমামতের সমকক্ষ নয়। কারণ শিয়া মাযহাবের মতে হযরত ফাতিমা যাহরাও (সালামুল্লাহ আলাইহা) মা'সুম ছিলেন, যদিও তিনি ইমামতের আধিকারিণী ছিলেন না। অনুরূপ হযরত মারিয়াম (আ.) ও ইসমাতের অধিকারিণী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ আল্লাহ্র ওলীগণের মধ্যেও অন্য কেউ এ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যদিও আমরা তাদের সম্পর্কে অবগত নই। বস্তুতঃ মা'সুম ব্যক্তিগণের পরিচয় মহান আল্লাহ কর্তৃক উপস্থাপিত না হলে তাদেরকে চিনা সম্ভব নয়।

১৭তম পাঠ

ইমাম থাকার প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা :

বিশ্বাসগত বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন না এমন অধিকাংশ মানুষই মনে করেন যে, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমামত প্রসঙ্গে বিরোধ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে শিয়াদের বিশ্বাস : মহানবী (সা.) 'আলী ইবনে আবি তালিবকে' (আ.) ইসলামী সমাজের পরিচালনার জন্যে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন। কি আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস যে, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি এবং জনগণ নিজেদের পছন্দ মত নেতা নির্বাচন করেছিল। তিনি (জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা) তার উত্তরাধিকারীকে ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন করেছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে নেতা নির্বাচনের ায়িত্ব ছয় সদস্য বিশিষ্ট গোষ্ঠীর নিকট অর্পণ করা হয়েছিল। অপরদিকে চতুর্থ খলিফাও আবার প্রথমবারের মত সাধারণ মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত হয়োছিলেন। অতএব মুসলমানদের মধ্যে নেতা নির্বাচনের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোন পন্থা ছিল না। ফলে চতুর্থ খলিফার পর যার সামরিক শক্তি অধিক ছিল, সে- ই এ স্থান দখল করেছিল, যেমন : অনৈসলামিক দেশসমূহেও মোটামুটি এ প্রক্রিয়া বিদ্যমান।

অন্যকথায় : তারা এ রকম মনে করেন যে, প্রথম ইমাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে শীয়াদের বিশ্বাস সেরূপ , যেরূপ আহলে সুন্নাত প্রথম খলিফা কর্তৃক ি তীয় খলিফার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করেন, পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, মহানবী (সা.) এর বক্তব্য মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, কি প্রথম খলিফার বক্তব্য মানুষ গ্রহণ করেছিল !

কি প্রশ্ন হল, প্রথম খলিফা এ অধিকার কোথা থেকে পেয়েছিলেন ? আল্লাহর রাসূল (সা.) (আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস মতে) ইসলামের জন্যে কেন তার (প্রথম খলিফা) মত আন্তরিকতা প্রদর্শন করেননি এবং নব গঠিত ইসলামী সমাজকে অভিভাবকহীন অবস্থায় রেখে গেলেন অথচ

যুদ্ধের জন্যে মদীনা থেকে অন্যত্র যাওয়ার সময়ও একজনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন এবং যেখানে স্বয়ং তিনিই (এ বিষয়ের উপর) তার উম্মতদের মধ্যে মতবিরোধ ও বিভ্রান্তির সংবাদ দিয়েছিলেন ? এছাড়া ও লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলতঃ মতবিরোধ সর্বাগ্রে এখানেই যে, ইমামত কি এক ধর্মীয় মর্যাদা, যা ঐশী বিধানের অনুগামী ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়? নাকি পার্থিব রাজকীয় মর্যাদা, যা সামাজিক নির্বাহকের অনুগামী ? শিয়াদের বিশ্বাস যে, স্বয়ং মহানবীও (সা.) নিজ থেকে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেননি। বরং মহান আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েই এ কর্ম সম্পাদর্ন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির দর্শন পবিত্র ইমামগণের নিয়োগদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর এ ধরনের ইমামের উপস্থিতিতেই রাসূল (সা.)- এর ইন্তিকালের পর ইসলামী সমাজের অপরিহার্য বিষয়াদির নিশ্চয়তা প্রদান করা যেতে পারে।

এখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেন শিয়া সম্প্রদায়ের মতে ইমামত ‘মূল বিশ্বাসগত’ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয় - শুধুমাত্র একটি ফিকাহগত গৌণ বিষয় নয়। আর সেই সাথে   ষ্ট হয়ে যায় যে, কেন তারা তিনটি শর্ত (ঐশী জ্ঞান, ইসমাত ও আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত) বিবেচ্য বলে মনে করেন এবং কেন শিয়া সাধারণের মধ্যে এ ভাবার্থগুলো ঐশী আহকাম, প্রশাসন ও ইসলামী সমাজের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতৃত্বের ধারনার সাথে এমনভাবে মিশে আছে, যেন ইমামত শব্দটি এ ভাবার্থগুলোর সবগুলোকেই সমন্বিত করে।

এখন শিয়াদের সামগ্রিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ইমামতের তাৎপর্য ও মর্যাদার আলোকে এর বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইমাম থাকার প্রয়োজনীয়তা :

ি তীয় খণ্ডের ২য় পাঠে সু   ষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সফলতা, ওহীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ কর্তৃক পথপ্রদর্শনের সাথে সম্পকির্ত। আর প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল এই যে, কোন নবী প্রেরণ করবেন যাতে ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের পথ সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞান দান

করতে পারেন এবং মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, আর সেই সাথে যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে (আধ্যাত্মিক) পরিচর্যা করতে পারেন এবং তাদের যোগ্যতা অনুসারে পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে তাদেরকে পৌছাতে সচেষ্ট হতে পারেন। অনুরূপ তারা উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশে ইসলামের সামাজিক বিধানের প্রয়োগের দায়িত্বও নিবেন।

ি তীয় খণ্ডের ১৪ মত ও ১৫ তম পাঠে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম হল পবিত্র, চিরন্তন, সার্বজনীন ও অবিস্মৃত ধর্ম এবং ইসলামের নবী (সা.)- এর পর আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির দর্শন, তখনই কেবলমাত্র নবীগণের আবির্ভারের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে, যখন সর্বশেষ ঐশী শরীয়ত মানব সম্প্রদায়ের সকল প্রশ্নের জবাব প্রদানে সক্ষম হবে এবং বিশ্বের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত এ শরীয়তের অটুট থাকার নিশ্চয়তা থাকবে।

উল্লেখিত নিশ্চয়তা পবিত্র কোরানের রয়েছে এবং মহান আল্লাহ স্বয়ং সকল প্রকার বিকৃতি ও বিচ্যুতি থেকে প্রিয় গ্রন্থের সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা বিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কি ইসলামের সকল বিধি- বিধান কোরানের আয়াতের বাহ্যিক যুক্তি থেকে প্রকাশ পায় না। যেমন : নামাযের রাকাত সংখ্যা ও পদ্ধতি এবং আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় এমন অসংখ্য বিধান রয়েছে, যেগুলোকে পবিত্র কোরান থেকে উদঘাটন করা অসম্ভব। সাধারণত : পবিত্র কোরানে আহকাম ও কানুন বিশদভাবে বর্ণিত হয়নি। ফলে এগুলোর প্রশিক্ষণ ও সু   ষ্ট বর্ণনার দায়িত্ব মহানবী (সা.)- এর উপর অর্পণ করা হয়েছে, যাতে তিনি মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের (কোরানের ওহী ব্যতীত) মাধ্যমে ঐগুলোকে মানুষের জন্যে বর্ণনা করেন।[১২২] আর এভাবে ইসলাম পরিচিতির প্রকৃত উৎস হিসেবে তার সুন্নাহ বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কি   হযরত (সা.)- এর শিবেহ আবি তালিবের কয়েক বছরের বন্দীদশা, শত্রুদের সাথে একদশকাব্দী যুদ্ধ ইত্যাদির মত জীবনের সংকটময় মুহূর্তগুলো সাধারান মানুষের জন্যে ইসলামের বিভিন্ন আহকাম, বর্ণনার পথে ছিল প্রধান অন্তরায়। অপর দিকে সাহাবাগণ যা শিখতেন তা সংরিক্ষত থাকারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এমন কি অজু করার প্রক্রিয়া যা বর্ষপরম্পরায় মানুষের দৃষ্টি সীমায় সম্পাদিত হত তাও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

অতএব যেখানে এ সু ষ্ট বিষয়টি (যা মুসলমানদের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বা আছে এবং এর পরিবর্তন ও বিকৃতির মধ্যে কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য জড়িত ছিল না) বিরোধপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত ও গোত্রীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জটিল ও সূক্ষ্ম নিয়মসমূহের বর্ণনার ক্ষেত্রে বিকৃতি ও ভ্রান্তির সম্ভাবনা অবশ্যই অধিকতর ।[১২৩]

এ বিষয়টির আলোকে সু ষ্ট হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম কেবলমাত্র তখনই এক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে পৃথিবীর অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত মানুষের সকল প্রয়োজন ও প্রশ্নের জবাবদানে সক্ষম হবে যখন ীনের মূলভাষ্যে, সমাজের এ সকল কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধিত হবে, যেগুলো মহানবী (সা.)- এর পরলোক গমণের পর সংকট ও হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। আর এ নিশ্চয়তা বিধানের পথ মহানবী (সা.)- এর যোগ্য উত্তরসুরি নির্বাচন ব্যতীত কিছুই নয়। এ উত্তরসুরিকে একদিকে যেমন ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, যাতে ীনকে এর সকল দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তমরূপে বর্ণনা করতে পারেন। অপরদিকে তেমনি দৃঢ়রূপে পবিত্রতার অধিকারী হতে হবে, যাতে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানী প্ররোচনায় প্রভাবিত না হন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ীনের বিকৃতিতে লিপ্ত না হন। অনুরূপ মানব সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)- এর দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়ে, উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে পৌছে দিতেও তারা বদ্ধপরিকর। আর অনুকূল পরিস্থিতিতে সমাজের শাসন, পরিচালনা এবং ইসলামী বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্বে ন্যায়বিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দায়িত্বও তারা গ্রহণ করে থাকেন ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি কেবলমাত্র তখনই প্রভুর প্রজ্ঞার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে, যখন এমন পবিত্র ইমামগণকে নিয়োগ করা হবে, যারা একমাত্র নবুয়্যত ব্যতীত মহানবী (সা.)- এর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন।

আর এভাবেই একদিকে যেমন সমাজে ইমাম থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয়, অপরদিকে তেমনি তাদের ঐশী জ্ঞান ও পবিত্র মর্যাদাও। অনুরূপ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নির্বাচিত

হওয়ার ব্যাপারটিও ষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কারণ একমাত্র তিনিই জানেন এ ধরনের জ্ঞান ও মর্যাদা কাকে দিয়েছেন এবং তিনিই বস্তুতঃ তার বান্দাগণের উপর বিলায়াত ও কর্তৃত্বের অধিকার রাখেন। আর তিনিই এর অধিকার অপেক্ষাকৃত হ্রাসকৃত মাত্রায় উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রদান করতে সক্ষম।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, আহলে সুন্নাত কোন খলিফার ক্ষেত্রেই উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনটিকেই স্বীকার করেন না। মহান আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) পক্ষ থেকে নির্বাচিত হওয়ার দাবি যেমন তারা তুলেন না, তেমনি খলিফাগণের ঐশী জ্ঞান ও পবিত্রতার প্রসঙ্গও তুলেন না। বরং মানুষের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্নের জবাব দানের ক্ষেত্রে তাদের অসংখ্য ভুল- ভ্রান্তি ও অযোগ্যতার দৃষ্টান্ত তারা তাদের বিশ্বস্ত গ্রন্থসমূহে তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রথম খলিফা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেছিলেন :

انّ لی سیطانا یعترنی

আমার পশ্চাতে এমন এক শয়তান বিদ্যমান যে আমাকে বিভ্রান্ত করে ।[১২৪]

অনুরূপ িতীয় খলিফা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রথম খলিফার আনুগত্য স্বীকারকে 'فلتہ' (অর্থাৎ অবিলম্বকর্ম ও অবিবেচনাপূর্ণ কর্ম) নামকরণ করেছেন।[১২৫] অনুরূপ িতীয় খলিফা অসংখ্যবার এ বাক্যটি স্বীয় কন্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন :

لولا علیّ لھلک عمر

যদি আলী না থাকতেন, তবে আমি ওমর ধ্বংস হয়ে যেতাম।

অর্থাৎ যদি আলী (আ.) না থাকতেন তবে ওমর ধ্বংস হয়ে যেতন।[১২৬] এছাড়া তৃতীয় খলিফা[১২৭] এবং বনি উমাইয়্যা ও বনি আব্বাসের ভুল- ভ্রান্তির কথাতো বলারই অপেক্ষা রাখেনা। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কেউ ন্যূনতম ধারণা নিলেই এ সম্পর্কে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হতে পারবেন।

একমাত্র শিয়া সম্প্রদায়ই াদশ ইমামের ক্ষেত্রে এ শর্তত্রয়ে বিশ্বাসী। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইমামত প্রসঙ্গে তাদের বিশ্বাসের বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোন

ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তথাপিও পরবর্তী পাঠে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কিছু কিছু দলিলের উদ্ধৃতি দেয়ার আশা রাখি।

১৮তম পাঠ

ইমামের নিয়োগ

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা আলোচনা করেছি যে, পবিত্র ইমামের নির্বাচন ব্যতীত, নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি প্রভুর প্রজ্ঞার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজনীন ও চিরন্তন ধর্ম ইসলামের পরিপূর্ণতা এর সাথে সম্পর্কিত যে, মহানবী (সা.)- এর পর তার এমন সকল যোগ্য উত্তরসুরিগণ নির্বাচিত হবেন, যারা নবুয়্যত ও রিসালাত ব্যতীত মহানবী (সা.)- এর সকল ঐশী মর্যাদার অধিকারী হবেন।

এ বিষয়টিকে পবিত্র কোরানের আয়াতসমূহ এবং শিয়া সুন্নী উৎসর তাফসিরে বর্ণিত অসংখ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় ।

উদাহরণস্বরূপ সূরা মায়িদাহর তৃতীয় আয়াতটির কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে বলা হয়েছে :

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

“আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের ীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ীন মনোনীত করলাম।”

এ আয়তটি মহানবী (সা.)- এর পরলোক গমনের কয়েক মাস পূর্বে বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মোফাসসিরগণের মধ্যে মতৈক্য বিদ্যমান। ইসলামের কোন ক্ষতি করতে গিয়ে কাফেররা হতাশ হয়ে পড়েছে এ কথাটির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে উল্লেখিত আয়াতটির পূর্বেই। যথা

(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ...)

আজ কাফিররা তোমাদের ীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে ...

অতঃপর গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে যে, আজ তোমাদের ীনকে পরিপূর্ণ এবং আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান, কাল ও পাত্রের উপর বর্ণিত অসংখ্য

রেওয়ায়েতের আলোকে সু ষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এ পরিপূর্ণতা (اکمال) ও সম্পূর্ণতা (اتمام), যা ইসলামের ক্ষতি করতে কাফেরদের হতাশার সাথে সংশ্লিষ্ট তা মহানবী (সা.)- এর উত্তরসুরি নির্বাচনের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। কারণ ইসলামের শত্রুদের প্রত্যাশা ছিল মহানবী (সা.)- এর পরলোকগমণের পর (যেহেতু তার কোন পুত্র সন্তান ছিল না) ইসলামের কোন পৃষ্ঠপোষক থাকবে না এবং ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে বিলুপ্তিতে পতিত হবে। কি   তার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হওয়ায় ইসলাম ধর্ম এর পরিপূর্ণতা ও ঐশী অনুগ্রহের সম্পূর্ণতায় পৌছেছে। ফলে কাফেরদের সকল আশা ভস্মীভূত হয়েছে।[১২৮]

আর এর ঘটনাপ্রবাহ ছিল এরূপ : মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে সকল হাজীদেরকে একত্রিত করলেন এবং বিস্তারিত বক্তব্য দেয়ার পর উপস্থিত লোকদেরকে বিজ্ঞাসা করলেন :

الست اولی بکم من انفسکم

ওহে আমি কি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর বিলায়াত প্রাপ্ত নই?[১২৯]

সকলেই একবাক্যে ইতিবাচক জবাব প্রদান করল। অতঃপর আলী (আ.)- এর বাহু ধরে তাকে সকল মানুষের সম্মুখে উঁচু করে প্রদর্শন করলেন এবং বললেন :

من کنت مولاه فعلی مولاه

আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।

এভাবে ঐশী বিলায়তকে হযরত আলী (আ.)- এর জন্যে মহানবী (সা.) ঘোষণা করলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলেই তার [আলী (আ.)] আনুগত্য স্বীকার করলেন। তাদের মধ্যে িতীয় খলিফাও আমীরুল মু'মিনিন আলী (আ.)- এর আনুগত্য স্বীকারোত্তর অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছিলেন :

بخّ بخّ لک یا علیّ اصبحت مولای و مولی کلّ مومن و مومنة

হে আলী, তোমাকে অভিনন্দন ! অভিনন্দন ! (আজ থেকে) তুমি আমার মাওলা হয়ে গেলে এবং মাওলা হলে সকল মু'মিন নর- নারীরও।[১৩০]

আর এ দিনেই এ আয়তটি অবতীর্ণ হয়েছিল :

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

"আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের ীন পূর্ণাঙ্গ করলাম আর তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ীন মনোনীত করলাম।"

মহানবী (সা.) তাকবীর দিলেন এবং বললেন :

تمام نبوتی و تمام دین الله و لایة علی بعدی

আমার পরে আলীর বেলায়াতই হচ্ছে আল্লাহর ীনের পূর্ণতা এবং আমার নবুয়্যতীর পূর্ণতা স্বরূপ।

এছাড়া আহলে সুন্নাতের কোন কোন মনীষীও (حموینی) বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর ও ওমর 'জাবিরের' নিকট চেয়েছিল রাসূলকে (সা.) জিজ্ঞাসা করতে যে, এ বিলায়াত কি একমাত্র আলীর জন্যেই নির্ধারিত? হযরত (সা.) বললেন : বিশেষকরে আলী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমার ওয়াসিগণের জন্যেই নির্ধারিত। অতঃপর ওয়াসি কারা এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন :

علیّ اخی و وزیری و وارثی و وصیّی و خلیفتی فی امّتی و ولیّ کلّ مومن من بعدی ثمّ ابنی الحسن ثمّ ابنی الحسین ثمّ تسعة من ولد ابنی الحسین واحد القران معهم و هم مع القران لا یفارقونه و لا یفارقهم حتّی یردوا علیّ الحوض

আলী (আ.) আমার ভাই, উজির, উত্তরাধিকারী, ওয়াসি এবং আমার উম্মতের জন্যে খলিফা ও আমার পর মু'মিনগণের অভিভাবক। অতঃপর হাসান (আ.) অতঃপর হুসাইন (আ.) অতঃপর হুসাইনের (আ.) সন্তানগণের মধ্য থেকে নয়জন, উত্তর উত্তর ওয়ালী হবেন। কোরান তাদের সাথে এবং তারাও কোরানের সাথে। আর এ কোরান তাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং তারাও এ কোরান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না হাউজে কাওছারে আমাদের সাথে মিলিত হবে।[১৩১]

বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায় মহানবী (সা.) পূর্বেই আলী (আ.)- এর ইমামতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। কি তিনি এতে সন্ত্রস্ত

ছিলেন যে, হয়ত মানুষ এ বিষয়টিকে হযরত (সা.)- এর ব্যক্তিগত মতামত বলে মনে করবে এবং একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যথাযথ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, যাতে এ ঘোষণার জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ফলে নিম্নলিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)

হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তার বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। (সুরা মায়িদাহ - ৬৭)[১৩২]

এ বিষয়টির প্রচারের আবশ্যকতার উপর গুরুত্বারোপ করতঃ (যে এ বিষয়টি অন্যান্য সকল বাণীর মতই এবং এর প্রচার না করা সমস্ত রিসালাতের প্রচার থেকে বিরত থাকার শামিল) হযরতকে (সা.) এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, মহান আল্লাহ তাকে সকল অনাকাংখিত প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করবেন। আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (সা.) অনুধাবন করলেন যে, সে শুভলগ্ন উপস্থিত হয়েছে এবং এর অধিক বিলম্ব করা সঠিক নয়। অতএব 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে এ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হলেন।[১৩৩]

তবে এ দিনটির বিশেষত্ব হল এই যে, এ দিনে আলীর জন্য ইমামতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা (.আ) বাইআত বা আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। ও নতুবা রাসূল (সা.) তার রিসালাতের সময়কালে এশাধিকবার ও একাধিকরূপে আলী (আ.)- এর উত্তরাধিকারিত্বের কথা বর্ণনা করেছিলেন। নবুয়্যতের প্রারম্ভিক বছর , গুলোতে যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ এবং তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন কর। (সূরা শুয়ারা- ২১৪) এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এবং মহানবী (সা.) তার সকল নিকটাত্মীয়দেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : সর্বপ্রথমে যে আমার আহবানে সাড়া দিবে, সেই আমার উত্তরাধিকারী হবে। দলমত নির্বিশেষে সকলেই এ ব্যাপারে

একমত যে, সর্বপ্রথমেই যিনি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলেন তিনি আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ব্যতীত আর কেউ নন। [১৩৪] অনুরূপ,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আল্লাহর রাসূল তার উলুল আমরদেরকে (উত্তরসুরিগণ)। (নিসা- ৫৯)

উল্লেখিত আয়াতটি যখন নাযিল হয়োছিল এবং "উলূল আমর হিসাবে যার পরম আনুগত্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আর তার আনুগত্য করাকে নবী (সা.)- এর আনুগত্য করার সমকক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে'' তখন 'জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী' হযরত (সা.)- এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন এই উলূল আমর কারা, যাদের আনুগত্য করা আপনার আনুগত্যের সমকক্ষ বলা হয়েছে ? তিনি বললেন :

هم خلفائی یا جابر و ائمة المسلمین من بعدی اوّلهم علیّ بن ابی طالب ثمّ الحسن ثمّ السحین ثمّ علی بن الحسین ثمّ محمّد بن علی المعروف فی التوراة بالباقر- ستدرکه یا جابر فاذا لقیته فاقرأه منی السلام- ثمّ الصادق جعفر بن محمد ثمّ موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم سمیّی و کنیّی حجة الله فی ارضه وبقیّته فی عباده ابن الحسن بن علی........

হে জাবির !তারা হলেন আমার পর, আমার খলিফা ও মুসলমানদের ইমাম। তাদের প্রথম ব্যক্তি হলেন আলী ইবনে আবি তালিব, অতঃপর হাসান, অতঃপর হুসাইন, অতঃপর আলী ইবনে হুসাইন, অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, যিনি তৌরাতে বাক্বির বলে পরিচিত, হে জাবির যখন !তার সাক্ষাৎ লাভ করবে, আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানাবে অতঃপর সাদিক জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, অতঃপর মূসা ইবনে জাফর, অতঃপর আলী ইবনে মূসা, অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, অতঃপর আলী ইবনে মুহাম্মাদ, অতঃপর হাসান ইবনে আলী, অতঃপর আমার নাম ও কুনীয়াতধারী পৃথিবীতে আল্লাহর হুজ্জাত তারবান্দাগণের (মনোনিত) মধ্যে সর্বশেষ হাসান ইবনে আলী ।[১৩৫]

এবং রাসূল (সা.) এর ভবিষ াণী অনুসারে জাবির (রা.) হযরত ইমাম বাকির (আ.) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং হযরতের (সা.) সালাম তার নিকট পৌছে দিয়েছিলেন।

অপর একটি হাদীসে আবু বাসির থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উলূল আমর প্রাসংগিক আয়াতটি সম্পর্কে ইমাম সাদিক (আ.)- এর নিকট প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন : (আয়াতটি) আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) হাসান (আ.) ও হোসাইন (আ.)- এর সম্মানে অবতীর্ণ হয়েছে। সবিনয়ে নিবেদন করলাম, মানুষ জানতে চায় পবিত্র কোরানে আলী (আ.) ও আহলে বাইতগণকে (আ.) তাদের নাম উল্লেখ পূর্বক পরিচয় দেয়নি কেন ? তিনি বললেন : তাদেরকে বল, নামাযের যে আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে তিন রাকাত বা চার রাকাতের কোন উল্লেখ করা হয়নি এবং মহানবীই (সা.) ঐগুলো মানুষের নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন। অনুরূপ যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ও মহানবীকে (সা.) ব্যাখ্যা করতে হয়েছে এবং তিনিই এরূপ বলেছিলেন,

من كنت مولاه فعلى مولاه

আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।

এছাড়াও তিনি বলেছিলেন,

اوصيكم بكتاب الله و اهل بيتى فانى سألت الله عزّوجلّ ان لا يفرق بينهما حتّى يورد هما علىّ الحوض فأعطانى ذالک

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বাইতের (সান্নিধ্যে) থাকার জন্যে সুপারিশ করছি বাস্তবিকই মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহর কাছে এ আবেদন জানিয়েছিলাম যে, তিনি যেন কোরানকে আহলে বাইত থেকে পৃথক না করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের সাথে হাউজে কাওছারে মিলিত হয়, এবং মহান আল্লাহ আমার আবেদন গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ বললেন :

لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، أنّهم لن يخرجوكم من باب هدى، ولن يدخلوكم في باب ضلال

অর্থাৎ তাদের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হতে তোমরা সক্ষম নও, তারা প্রকৃতই তোমাদের থেকে অধিকতর জ্ঞাত। বস্তুতঃ তারা তোমাদেরকে কখনোই হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করবেন না।

এছাড়া মহনবী (সা.) একাধিকবার (বিশেষকরে তার জীবনের অন্তিম দিন গুলোতে) বলেছিলেন :

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانّهما لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض

বস্তুতঃ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি গুরুভার রেখে গেলাম : আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বাইত। প্রকৃতপক্ষে এতদুভয় পর র থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না হাউজে কাওছারে আমাদের সাথে মিলিত হয়।[১৩৬]

আরও বলেছিলেন :

الا انّ مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلّف عنها غرق

অর্থাৎ জেনে রাখ, বস্তুতঃ আমার আহলে বাইতের উদাহরণ হল নূহের তরীর মত - যে কেউ এতে আরোহণ করবে নিস্তার পাবে, আর যে কেউ একে ত্যাগ করবে নিমজ্জিত হবে।[১৩৭]

অনুরূপ আলী ইবনে আবি তালিবকে (আ.) উদ্দেশ্য করে মহানবী (সা.) একাধিকবার বলেছিলেন:

انت ولیّ کل مومن بعدی

'তুমি হলে আমার পর সকল মু'মিনের ওয়ালী' ।[১৩৮]

এছাড়াও এমন অনেক হাদীস বিদ্যমান যেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা ক্ষুদ্রপরিসরে সম্ভব নয়।[১৩৯]

১৯তম পাঠ

ইমামের ইসমাত ও জ্ঞান

ভূমিকা :

িতীয় খণ্ডের ১৬ নং পাঠে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কেন্দবিন্দু হল তিনটি। যথা : ইমামকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত হতে হবে, সুদৃঢ় ইসমাত বা পবিত্রতার অধিকারী হতে হবে এবং ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। িতীয় খণ্ডের ১৭ নং পাঠে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলাম। ৩৮নং পাঠে পবিত্র ইমামগণের (আ.) মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার স্বপক্ষে কিছু কিছু উদ্ধৃতিগত দলিলের উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য পাঠে এখন আমরা তাদের ইসমাত ও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান সম্পর্কে আলোকপাত করব।

ইমামের ইসমাত :

'ইমামত হল আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা যা মহান আল্লাহ আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ও তার সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন', তা প্রমাণের পর, তাদের ইসমাতকে নিম্নলিখিত আয়াত থেকে উদ্ভাবন করা যায় :

(لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)

আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। (সূরা বাকারা- ১২৪)

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আল্লাহ প্রদত্ত এ মর্যাদা তাদের জন্যেই যারা গুনাহ ারা কলুষিত নন।

অনুরূপ সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে উল্লেখিত 'উলূল আমর' প্রাসঙ্গিক আয়াতটি যাতে তাদের নিঃশর্ত আনুগত্য অপরিহার্য বলা হয়েছে এবং এ আনুগত্যকে রাসূল (সা.)- এর আনুগত্যের শামিল করা হয়েছে সে আয়াতটি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের আনুগত্য মহান আল্লাহর

আনুগত্যের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। অতএব তাদের নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ তাদের ইসমাতের নিশ্চয়তারই অর্থ বহন করে।

একইভাবে আহলে বাইত (আ.)- এর ইসমাতকে আয়াতে তাতহিরের মাধ্যমেও প্রমাণ করা যায়। পবিত্র কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে :

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

হে নবীর আহলে বাইত! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের হতে সকল অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব- ৩৩)

বান্দাগণের পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহর বিধিগত ইরাদা কারো জন্যে নির্ধারিত নয়। সুতরাং আল্লাহর যে ইরাদা আহলে বাইতগণের (আ.) জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা হল প্রভুর সুনির্ধারিত ইরাদা, যা অপরিবর্তনীয়; যেমনটি বলা হয় :

(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)

তার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন হও, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন- ৮২)

আর চূড়ান্তরূপে পবিত্রকরণ ও সকল প্রকার কদর্য কলুষতা থেকে মুক্ত করণের অর্থই হল পবিত্রতা। অপরদিকে আমরা জানি যে, শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত মুসলমানদের কোন সম্প্রদায়ই রাসূল (সা.)- এর কোন নিকটাত্মীয়ের পবিত্রতার দাবি তুলে না। শিয়া সম্প্রদায় নবী কন্যা হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.) এবং াদশ ইমামের পবিত্রতায় বা ইসমাতে বিশ্বাস করে।[১৪০]

উল্লেখ্য যে, সত্তরাধিক রেওয়ায়েত (যে গুলোর অধিকাংশই আহলে সুন্নাতের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন) প্রমাণ করে যে, এ আয়াতটি 'পাক পাঞ্জাতনের' মর্যাদায় নাযিল হয়েছে।[১৪১] শেখ সাদুক, আমীরুল মু'মিনিন (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : হে আলী! এ আয়াতটি তোমার, হাসান, হুসাইন এবং তার বংশের ইমামদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ

হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার পর কয়জন ইমাম রয়েছেন ? জবাবে তিনি বললেন : হে আলী! তুমি অতঃপর হাসান, অতঃপর হুসাইন, অতঃপর তার সন্তান আলী, অতঃপর তার সন্তান মুহাম্মদ, অতঃপর তার সন্তান জা'ফর, অতঃপর তার সন্তান মুসা, অতঃপর তার সন্তান আলী, অতঃপর তার সন্তান মুহাম্মদ, অতঃপর তার সন্তান আলী, অতপর তার সন্তান হাসান এবং তৎপর তার সন্তান আল্লাহর হুজ্জাত (আলাইহিমুস সালাম আজমাইন)।

অতঃপর মহানবী (সা.) বললেন : এ রূপেই তাদের নাম আল্লাহর আরশের পাতায় লিখা আছে এবং আমি মহান আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এগুলো কাদের নাম ? তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ তোমার পর তারা হলেন ইমাম, তারা মাসুম ও পবিত্র হয়েছেন এবং তাদের শত্রুরা আমা কর্তৃক অভিশম্পাত প্রাপ্ত হবে।[১৪২]

অনুরূপ 'হাদীসে সাকালাইন' যাতে মহানবী (সা.) তার আহলে বাইত ও ইতরাতকে কোরানের সমকক্ষরূপে স্থান দিয়েছেন এবং এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, কখনোই তারা (অর্থাৎ কোরান ও ইতরাত) পর র থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, সেটিও তাদের ইসমাতের স্বপক্ষে একটি সু ষ্ট দলিল। কারণ ক্ষুদ্রতম কোন পাপে লিপ্ত হওয়ার মানে (এমনকি ভুলক্রমেও যদি হয়ে থাকে) কার্যক্ষেত্রে কোরান থেকে তাদের পৃথক হওয়া।

ইমামের জ্ঞান :

নিঃসন্দেহে নবী (সা.)- এর আহলে বাইত (আ.) তার জ্ঞান থেকে অন্য সকলের চেয়ে অধিকতর লাভবান হয়েছিলেন। তাই তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন,

لا تعلموهم فانّهم اعلم منكم

তাদেরকে অনুধাবন করা যায় না সুতরাং নিশ্চয়ই তারা তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ।[১৪৩]

বিশেষকরে স্বয়ং আলী (আ.) যিনি শৈশব থেকেই রাসূল (সা.)- এর আশ্রয়ে পরিচর্যিত হয়েছেন এবং হযরত (সা.) এর জীবনের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত তার সং র্শে থেকে সর্বদা জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত ছিলেন। মহানী (সা.) হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে বলেন :

انا مدينة العلم و عليّ بابها

আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হল তার ার ।[১৪৪]

অপরদিকে স্বয়ং আমীরুল মু'মিনিন (আ.) থেকেই বর্ণিত হয়েছে :

ان رسول الله صلى الله عليه و اله-علمنى الف باب و كلّ باب يفتح الف باب فذالک الف الف باب حتى علمت ما كان و ما يكون الى يوم القيامة و علمت علم المنايا و البلايا وفصل الخطب

অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (সা.) জ্ঞানের সহস্রটি ার আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যাদের প্রতিটি আবার সহস্র ারে উন্মুক্ত হয়, ঐগুলোর প্রতিটি এভাবে সহস্র সহস্র ারে উন্মুক্ত হয়, এমনকি আমি জানি, যা ছিল এবং ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা হবে তাও এবং আমি শিখেছি মৃত্যুসমূহ (منايا) এবং বিপদ- আপদসমূহ (بلايا) এবং প্রকৃত বিচারের (فصل الخطب) জ্ঞান।[১৪৫]

কি ইমামগণের (আ.) জ্ঞান, নবী (সা.)- এর নিকট থেকে (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) শ্রুত জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। বরং তারা এক প্রকার অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যা, ইলহাম ও তাহদীসরূপে তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল।[১৪৬] এ ধরনের ইলহামা হযরত খিজর ও যুলকারনাইন[১৪৭] এবং হযরত মারিয়াম ও মূসা (আ.) এর মায়ের প্রতি[১৪৮] করা হয়েছিল। এগুলোর কিছু কিছু পবিত্র কোরানে ওহী নামে উল্লেখিত হয়েছে। তবে এর অর্থ নবুয়্যতের ওহী নয়। আর এ ধরনের জ্ঞানের ফলেই পবিত্র ইমামগণের কেউ কেউ শৈশবেই ইমামতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ও সকল কিছু জ্ঞাত ছিলেন এবং অন্য কারও নিকট জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তাদের ছিল না।

এ বিষয়টি স্বয়ং পবিত্র ইমামগণ (আ.) থেকে বর্ণিত অসংখ্য রেওয়ায়েত থেকে (এবং তাদের প্রমাণিত ইসমাত ও হুজ্জিয়াতের কথা বিবেচনা করে) প্রমাণিত হয়। এগুলোর কোন কোনটির উপর আলোকপাত করার পূর্বে পবিত্র কোরানের এমন একটি আয়াতের উল্লেখ করব যাতে

মহানবী (সা.) এর সত্যবাদিতার সাক্ষ্যস্বরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে من عنده علم الكتاب (যার নিকট রয়েছে কিতাবের জ্ঞান) বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে । আয়াতটি হল :

(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)

বলুন, আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষি হিসাবে যথেষ্ট। (সূরা রা'দ- ৪৩)

নিঃসন্দেহে এমন কেউ যার সাক্ষী মহান আল্লাহর সাক্ষীর নিকটবর্তী বলে পরিগণিত হয়েছে এবং কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, যাকে এরূপ সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছে তিনি মহা মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

অপর একটি আয়াতেও এ সাক্ষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে রাসূল (সা.) এর পদাংকানুসারীরূপে গণনা করা হয়েছে :

(أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)

তারা কি তাদের সমতুল্য যারা প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রতিপালক প্রেরিত ষ্ট প্রমাণের উপর, যার অনুসরণ করে তার প্রেরিত সাক্ষি । (সূরা হুদ- ১৭)

আর منه (মিনহু) শব্দটি প্রমাণ করে যে, এ সাক্ষী হলেন নবী (সা.) এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং তারই আহলে বাইত। শিয়া ও সুন্নী উৎসের একাধিক রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সাক্ষী হলেন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য, ইবনে মু'যিল শাফিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে আতা থেকে বর্ণনা করেছেন : একদা ইমাম বাক্বির (আ.)- এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের (আহলে কিতাবের আলেমদের মধ্যে এক ব্যক্তি, যিনি রাসূল (সা.)- এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) পুত্র অতিক্রম করছিল। হযরত বাক্বির (আ.)- এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম :

(অর্থাৎ যার নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে) কি ঐ ব্যক্তির পিতাকে বুঝানো হয়েছে ? জবাবে তিনি বললেনঃ না, বরং আলী ইবনে আবি তালিবকে (আ.) বুঝানো হয়েছে। তেমনি وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ (অর্থাৎ যার অনুসরণ করে তার প্রেরিত সাক্ষী) এবং انما وليكم (অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের ওয়ালী) (সূরা মায়িদাহ - ৫৫) আয়াত য়ও তার সম্মানে নাযিল হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎস থেকে বর্ণিত একাধিক রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় যে, সূরা হুদে উল্লেখিত شاهد(শাহিদ) হলেন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)।[১৪৯] তদুপরি منه(মিনহু) এর উল্লেখিত বিশেষত্বের আলোকে সু   ষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এর দৃষ্টান্ত আলী (আ.) ব্যতীত আর কেউ নন।

কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার গুরুত্ব তখনই সু   ষ্ট হয়, যখন হযরত সোলাইমান (আ.)- এর সময় বিলকিসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা পবিত্র কোরানে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় :

(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ)

কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, ‘আপনি চক্ষুর পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিব। (সূরা নামল- ৪০)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিতাবের কিছু অংশের জ্ঞান থাকার ফলেই এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এথেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, সমগ্র কিতাবের জ্ঞান কি ধরনের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে ! আর এটি হল তা- ই যা ইমাম সাদিকে (আ.) থেকে সুদাইর বর্ণনা করেছিলেন।

সুদাইর বলেন : আমি আবু বাসির, ইয়াহ্ইয়া বায্যায এবং দাউদ ইবনে কাছির, ইমাম সাদিক (আ.)- এর সভায় উপস্থিত ছিলাম; হযরত ক্রোধপূর্ণ অবস্থায় সভাস্থলে প্রবেশ করলেন এবং

আসন গ্রহণান্তে বললেন : আশ্চর্য হই ঐ সকল লোকদের জন্যে, যারা মনে করে যে, আমরা অদৃশ্য- জ্ঞানের অধিকারী অথচ মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন। আমি চেয়েছিলাম আমরা দাসীকে ভর্ৎসনা করব কি সে পলায়ন করেছে এবং আমি জানিনা কোন কক্ষে গিয়েছে।[১৫০]

সুদাইর বলেন : যখন হযরত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশে উদ্যত হলেন, আমি আবু বাসীর এবং মাইসার, তার সাথে গেলাম এবং সবিনয়ে নিবেদন করলাম : আমরা আপনার জন্যে উৎসর্গ হব, দাসী সম্পর্কে আপনার অভিব্যক্তি আমরা অনুধাবন করেছি; আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী । কি কখনোই আপনার অদৃশ্য জ্ঞানের ব্যাপারে দাবি করি না।

হযরত বললেন : ওহে সুদাইর তুমি কি কোরান পড়নি ? বললাম : পড়েছি। তিনি বললেন : এ আয়তটি পড়নি ?

(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ)

কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিব। ।

জবাবে বললাম : অপনার জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ হোক, পড়েছি।

তিনি বললেন : তুমি জান, ঐ ব্যক্তি কিতাবের জ্ঞানের কতটুকু অবহিত ছিল ? জবাবে নিবেদন করলামঃ অনুগ্রহপূর্বক আপনিই বলুন। তিনি বললেন : প্রশস্ত সমুদ্রের এক বিন্দু পরিমাণ! অতঃপর বললেন : এ আয়াতটি কি পড়েছ ?

(كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)

বলুন, আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষি হিসাবে যথেষ্ট। বললাম : জী হ্যাঁ। পুনরায় তিনি বললেন : যিনি সমস্ত কিতাবের জ্ঞান

রাখেন তিনি অধিক জ্ঞানী, না যিনি কিতাবের স্বল্প কিছু জ্ঞানের অধিকারী। বললাম, যিনি সমস্ত কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী!

অতঃপর স্বীয় বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে ইমাম (আ.) বললেন : আল্লাহর শপথ সমস্ত কিতাবের জ্ঞান আমাদের কাছে বিদ্যমান আল্লাহর শপথ সমস্ত কিতাবের জ্ঞান আমাদের নিকট বিদ্যমান।[১৫১]

এখন আহলে বাইতের (আ.) জ্ঞান প্রসঙ্গে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব।

হযরত ইমাম রেজা (আ.) ইমামতের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেছিলেন : যখন মহান আল্লাহ কাউকে (ইমামরূপে) মানুষের জন্যে নির্বাচন করেন, তখন তাকে দয়ের প্রশস্ততা প্রদান করেন প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা তার দয়ে স্থাপন করেন এবং তার প্রতি জ্ঞান ইলহাম করেন যাতে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদানেই অক্ষমতা প্রকাশ না করেন এবং সত্যকে শনাক্তকরণে বিব্রত না হন। অতএব তিনি পবিত্র এবং আল্লাহর অনুগ্রহ, অনুমোদন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল প্রকার ভুল- ত্রুটি থেকে নিরাপদে থাকবেন। মহান আল্লাহ তাকে এ বৈশিষ্ট্যগুলো দান করেন, যাতে তার বান্দাদের জন্যে চূড়ান্ত প্রমাণ ও সাক্ষি হতে পারেন। আর এটি হল মহান আল্লাহরই অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন।

অতঃপর তিনি বললেন : মানুষ কি এমন কাউকে শনাক্ত ও নির্বাচন করতে সক্ষম ? তাদের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তি কি এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ?[১৫২]

এছাড়া হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া মাদায়েনী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম সাদিক (আ.)- এর নিকট সবিনয়ে নিবেদন করেছিলাম : যখন ইমামের (আ.) নিকট কোন প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি কিরূপে (কোন জ্ঞানের মাধ্যমে) এর জবাব প্রদান করেন ? জবাবে বললেন : কখনো কখনো তার প্রতি ইলহাম হয়, কখনো কখনো তিনি ফেরেস্তা হতে শুনে থাকেন আবার কখনোবা উভয় প্রক্রিয়ায়।[১৫৩]

অপর এক রেওয়ায়েতে ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : যদি কোন ইমাম না জানেন যে, তার উপর কী সংকট আপতিত হবে, তার কর্ম কোথায় সম্পন্ন হবে, তবে সে ইমাম মানুষের জন্যে আল্লাহর হুজ্জাত হতে পারে না।[১৫৪]

অনুরূপ ইমাম সাদিক (আ.) কর্তৃক আরও বর্ণিত হয়েছে : যখন ইমাম কোন কিছুকে অনুধাবন করতে চান , তখন মহান আল্লাহ তাকে তা অবহিত করেন।[১৫৫]

এছাড়া একাধিক রেওয়ায়েতে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন : রূহ এমন এক সৃষ্টি, যা জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আ.) অপেক্ষা সমুন্নত। আর তা মহানবী (সা.)- এর নিকট ছিল এবং তার পরে ইমামগণের (আ.) নিকট বিদ্যমান থেকে তাদেরকে সংরক্ষণ করে।[১৫৬]

২০তম পাঠ

হযরত মাহ্দী (.আ)

ভূমিকা :

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে প্রসঙ্গক্রমে আমরা াদশ ইমামের (আ.) নাম সম্বলিত কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। এছাড়াও শিয়া ও সুন্নী উৎস থেকে এমন অসংখ্য রেওয়ায়েত রয়েছে যেগুলোর কোন কোনটিতে মহানবী (সা.) থেকে শুধুমাত্র তাদের সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোনটিতে এ কথাটিও সংযুক্ত আছে যে, তাদের সকলেই কোরাইশ বংশের। অপর কিছুতে আবার তাদের সংখ্যাকে বনি ইসরাঈলের গোত্রপতিদের সমসংখ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোন কোনটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে নয়জন, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সন্তান। অতঃপর আহলে সুন্নতের কোন কোন রেওয়ায়েত এবং শিয়া উৎস থেকে বর্ণিত কোন কোন মুতাওয়াতির হাদীসে তাদের প্রত্যেকের নাম বর্ণিত হয়েছে।[১৫৭] অনুরূপ শিয়া উৎস থেকে আরও অনেক হাদীসে আছে যাতে প্রত্যেক ইমামের (আ.) ইমামত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ ক্ষুদ্রপরিসরে এগুলোর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা সম্ভব নয়।[১৫৮]

ফলে এ অধ্যায়ের সর্বশেষ পাঠে আমরা া শতম ইমাম হযরত মাহ্দীর (আ.) (আল্লাহ তার আত্মপ্রকাশ ত্বরান্বিত করুন) সম্পর্কে আলোচনায় মনোনিবেশ করব এবং সংক্ষিপ্ত কলেবর রক্ষার স্বার্থে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করব।

বিশ্বব্যাপী ঐশী শাসনব্যবস্থা :

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, নবীগণের (আ.) আবির্ভাবের মূল ও প্রধাণ উদ্দেশ্য হল সচেতন ও স্বাধীনভাবে বিকাশ ও পূর্ণতা লাভের জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যা ওহীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের জন্যে বাস্তবায়ন করেছেন। এছাড়া অপর কিছু উদ্দেশ্যও ছিল যেগুলোর মধ্যে

যোগ্য ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, আত্মিক ও মানসিক পরিচর্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্বোপরি মহান নবীগণ (আ.) খোদাভীরুতা ও ঐশী মূল্যবোধের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সারা বিশ্বময় ন্যায়-নীতির বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। আর এ পথে তাদের প্রত্যেকেই যথাসম্ভব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান ও কালে আল্লাহর ঐশী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। কি তাদের কারও জন্যেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী ঐশী শাসনব্যবস্থা প্রচলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না।

তবে উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি না হওয়ার অর্থ, নবীগণের (আ.) জ্ঞান ও কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা অথবা পরিচালনা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অক্ষমতা নয়। অনুরূপ নবীগণের (আ.) আবির্ভাবের পশ্চাতে প্রভুর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি তা-ও নয়। কারণ, ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানব সম্প্রদায়ের মুক্ত বিকাশ ও পূর্ণতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই হল প্রভুর উদ্দেশ্য । যেমনটি পবিত্র কোরানেও বর্ণিত হয়েছে :

(لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)

যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। (সূরা নিসা-১৬৫)

সুতরাং সত্য ধর্ম গ্রহণে ও ঐশী নেতৃবর্গকে অনুসরণে বাধ্য করা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। ফলে উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, প্রভুর মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

অপরদিকে মহান আল্লাহ ঐশী গ্রন্থসমূহে বিশ্বের সর্বত্র ঐশী হুকুমতের বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি’ দিয়েছেন যাকে মানব সম্প্রদায়ের বৃহত্তর পরিসরে সত্য ীন গ্রহণের ক্ষেত্র সম্পর্কে একপ্রকার ভবিষ্য াণী বলা যেতে পারে। যখন মানব সম্প্রদায় সকল প্রতিষ্ঠান ও সকল শাসন ব্যবস্থা থেকে নিরাশ হয়ে পড়বে তখন সুনির্বাচিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিসমষ্টির মাধ্যমে প্রভুর অদৃশ্য সাহায্যে, বিশ্বময় ঐশী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পথ থেকে সকল প্রকার অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতঃ অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানবতার ারে ন্যায় ও সুবিচার পৌঁছে দেয়া হবে। বলা যেতে

পারে তখন সর্বশেষ নবীকে (সা.) প্রেরণ এবং তার বিশ্বজনীন ও চিরন্তন ধর্মের প্রবর্তনের পশ্চাতে প্রভুর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সফল হবে। কারণ তার সম্পর্কেই বলা হয়েছে :

(لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ....)

অপর সমস্ত ীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্যে ...[১৫৯]

'ইমামত হল নবুয়্যতের পরিসমাপক এবং খাতামিয়্যাতের পশ্চাতে হিকমাতস্বরূপ'- এর ভিত্তিতে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রভুর উদ্দেশ্য সর্বশেষ ইমামের মাধ্যমেই বাস্তবরূপ লাভ করবে। আর এটি হল, সে বিষয় যা মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে ইমাম মাহদী (আ.) (আমাদের আত্মা তার জন্যে উৎসর্গ হোক) সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে সর্বপ্রথমে এ ধরনের হুকুমতের সুসংবাদবাহী আয়াতসমূহকে পবিত্র কোরান থেকে উল্লেখ করব। অতঃপর এ সম্পর্কিত কিছু রেওয়ায়েতের প্রতি ইংগিত করব।

আল্লাহর প্রতি তি :

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানে উল্লেখ করেছেন :

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)

আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমরা যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া- ১০৫)

সূরা আ'রাফের অপর একটি আয়াতে (১২৮- নং) হযরত মুসা (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই একদা মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে।

অপর এক স্থানে ফিরাউন, যে মানুষকে হীনবল করেছিল, তার কাহিনী উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে :

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদেরকে অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে। (সূরা কাসাস- ৫)

এ আয়াতটি বনি ইসরাঈল সম্পর্কে এবং ফিরাউনের থাবা থেকে মুক্তি লাভের পর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্পর্কে নাযিল হলেও(অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলাম) কথাটি প্রভুর অব্যাহত ইচ্ছা বা ইরাদার ইঙ্গিত বহন করে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকাংশ হাদীস অনুযায়ী উল্লেখিত আয়াতটি ইমাম মাহদীর (আ.) (আল্লাহ তার আবির্ভাব ত্বরানিত করুণ) অগমনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে বলে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপ অপর এক স্থানে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে :

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী গণকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে সুদৃঢ় করবেন তাদের ীনকে যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়- ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিবাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। (সুরা নূর- ৫৫)

আর হাদীসে এসেছে যে, এ প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত সহকারে হযরত মাহদীর (আ.) (আল্লাহ তার আবির্ভাব ত্বরান্বিত করুন) সময় বাস্তবরূপ লাভ করবে।[১৬০]

অনুরূপ অপর এক শ্রেণীর হাদীস, কিছু আয়াতানুসারে[১৬১] হযরত মাহদী (আ.) এর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখার স্বার্থে ঐগুলোর উল্লেখকরণ থেকে বিরত থাকব।[১৬২]

রেওয়ায়েত সমূহ :

হযরত মাহদী (আ.) (আল্লাহ তার আবির্ভাব ত্বরানিত করুন) সম্পর্কে শিয়া এবং সুন্নী উৎস থেকে হযরত মহানবী (সা.) থেকে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মুতাওয়াতিরের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর শুধুমাত্র যে সকল হাদীস আহলে সুন্নাতের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের আলেমদের সংখ্যাও তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছেছে তাদের একদল আলেমের বিশ্বাস যে, হযরত মাহদী (আ.)- এর ব্যাপারে ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরকার মধ্যে মতৈক্য বিদ্যমান।[১৬৩] আহলে সুন্নাতের কোন কোন আলেম হযরত মাহদী (আ.) ও তার আবির্ভাবের আলামত সম্পর্কে গ্রন্থও লিখেছেন।[১৬৪] এখন আহলে সুন্নাত কর্তৃক বর্ণিত কিছু হাদীস তুলে' ধরব। উদাহরণস্বরূপ : মহানবী (সা.) থেকে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে : যদিও পৃথিবীর আয়ুস্কাল একদিনের বেশী অবশিষ্ট না থাকে তবু মহান আল্লাহ ঐ দিনটিকে এমন সুদীর্ঘ করবেন, যাতে আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে আমার নামের অনুরূপ নামধারী কোন ব্যক্তি হুকুমত করতে পারে (এবং পৃথিবীকে তদনুরূপ ন্যায়নীতিতে পূর্ণ করবে যদনুরূপ অন্যায় ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল)[১৬৫] ।

উম্মে সালমাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : মাহদী আমার বংশধর থেকে এবং ফাতিমার (সা.) সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত ।[১৬৬]

আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন : নিশ্চয়ই আলী আমার পর উম্মতের ইমাম এবং তার সন্তানদের মধ্যে কায়িমুল মুনতাযার [ইমাম মাহদী (আ.)] থাকবে। যখন তার আবির্ভাব হবে তখন তিনি পৃথিবীকে ঐরূপ ন্যায়নীতিতে পরিপূর্ণ করবেন যেরূপ অন্যায়ে পরিপূর্ণ ছিল।[১৬৭]

লোকান্তর ও এর গূঢ় রহস্য :

াদশতম ইমামের বিশেষত্বসমূহের মধ্যে তার লোকান্তরিত হওয়ার ঘটনাটি অন্যতম, যা শিয়া মাযহাব কর্তৃক আহলে বাইত (আ.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে গুরুত্ব সহাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণতঃ হযরত আব্দুল আযিম হাসানি, ইমাম মুহম্মদ তাকি (আ.) থেকে, যিনি

তার পূর্বসুরিগণ (আ.) থেকে এবং তার পূর্বসুরিগণ (আ.) আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণর্না করেছেন : আমাদের উত্তরাধিকারী সুদীর্ঘ সময় লোকান্তরিত থাকবে, তখন আমাদের অনুসারীগণকে দেখতে পাবে ক্ষুধার্থ প্রাণী যেরূপ চারণভূমির সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সেরূপ তার সন্ধানে রত থাকবে কি তার সন্ধান পাবে না। জেনে রাখ, তাদের মধ্যে যে কেউ তার ীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তার ইমামের লোকান্তরের সময় আপন দয়কে কলুষতামুক্ত রাখবে কিয়ামতের দিবসে আমার সাথে আমার মর্যাদায় অবস্থান করবে। অতঃপর তিনি বলেন : যখন আমাদের উত্তরাধিকারী আত্মপ্রকাশ করবে তখন তার উপর অন্য কারও অধিকার বহাল থাকবে না (অর্থাৎ অত্যাচারী শাসকের কোন আধিপত্য তার উপর থাকবে না)। আর এ কারণে গোপনে তার জন্ম হবে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে।[১৬৮]

অনুরূপ ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তার পিতা থেকে এবং তার পিতা [ইমাম হুসাইন (আ.)] আমীরুল মু'মিনিন (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন :

আমাদের উত্তরাধিকারীর দু'টি গাইবাত রয়েছে যার একটি অপরটি অপেক্ষা দীর্ঘ এবং শুধুমাত্র যারা দৃঢ় বিশ্বাস ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবে তারাই তার ইমামতের উপর বিদ্যমান থাকবে।[১৬৯]

এখন আমরা, গাইবাতের রহস্য সু ষ্টরূপে প্রতীয়মান হওয়ার জন্যে পবিত্র ইমামগণের (আ.) অতীত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

আমরা জানি যে, রাসূল (সা.)- এর পর অধিকাংশ মানুষ, প্রথমে আবু বকরের কাছে অতঃপর ওমরের কাছে এবং তৎপর ওছমানের কাছে বাইয়াত করেছিলেন। তবে ওছমানের শাসনকালের শেষ দিকে অন্যায় বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক দুর্নীতির কারণে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে তাকে হত্যা করতঃ আমীরুল মু'মিনিন আলী (আ.)- এর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেছিল।

হযরত আলী (আ.) যিনি মহান আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) কর্তৃক মনোনীত খলিফা ছিলেন, তিনি পূর্ববর্তী খলিফাত্রয়ের শাসনামলে নবীন ইসলামী সমাজের কল্যাণার্থে নিরব ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং শুধুমাত্র কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ ব্যতিত কোন অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেননি।

এমতাবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে কোন পদক্ষেপ নিতেও কুন্ঠাবোধ করেননি। অপরদিকে তার কয়েক বছরের শাসনামল উষ্ট্রারোহী (জংগে জামাল), মোয়াবিয়ার (সিফিফন) ও খাওয়ারেজদের (নাহরাওয়ান) সাথে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে খাওয়ারেজীদেরই একজনের মাধ্যমে শাহাদাত বরণ করেন।

অনুরূপ ইমাম হাসান (আ.) ও মোয়াবিয়ার নির্দেশে বিষাক্রান্ত হন এবং মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াযিদ, যে ইসলামের সু ষ্ট নিয়মের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করত না, সে- ও উমাইয়্যাদের সিংহাসনে আরোহণ করে। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে ইসলামের কোন নাম ঠিকানাও অবশিষ্ট ছিল না। আর এ কারণে ইমাম হুসাইনের (আ.) পক্ষে, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তিনি নিজের নির্মম শাহাদাতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা হলেও সাবধানতা ও সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন এবং ইসলামকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তথাপি ইসলামের ন্যায়নীতিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সামাজিক পরিবেশ রূপ পরিগ্রহ করেনি। ফলে অন্যান্য ইমামগণ (আ.) ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সংহতকরণ, ইসলামের বিধি-বিধান, জ্ঞান ও আত্মিক পরিচর্যাগত দিকের প্রচার ও প্রসার এবং যোগ্য ব্যক্তিদের আত্মিক পরিশুদ্ধকরণে মনোনিবেশ করেছিলেন। আবার অনুকল পরিস্থিতিতে গোপনে জনগণকে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহ্বান করতেন। আর একই সাথে তাদেরকে বিশ্বব্যাপি ঐশী শাসনব্যবস্থার বিষয়ে আশাবাদী করে তুলতেন। অবশেষে তারা পর রায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

যা হোক পবিত্র ইমামগণ (আ.) আড়াই শতা ী ধরে অবর্ণনীয় সমস্যা ও সংকটের মধ্যেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে মানুষের নিকট তুলে ধরতে পেরেছিলেন - কিছুটা সাধারণভাবে, আবার কিছুটা বিশেষভাবে বিশ্বস্ত অনুসারী ও একান্ত ব্যক্তিবর্গের জন্যে। আর এভাবেই ইসলামী শিক্ষা, সমাজের সর্বস্তরে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল এবং মুহাম্মদী শরীয়তের নিশ্চয়তা বিধিত হয়েছিল। একই সাথে ইসলামী দেশসমূহের কোন কোন অংশে

অত্যাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্যে সংগঠনও রূপ লাভ করেছিল এবং অন্তঃতপক্ষে কিছুটা হলেও অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল।

তবে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ভয় ও উদ্বেগ বৃদ্ধির কারণ হল, হযরত মাহদীর (আ.) আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি, যা তাদের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। ফলে ইমাম হাসান আসকারী (আ.)-এর সমসাময়িক শাসকবর্গ তাকে কঠোর প্রহরার মধ্যে রেখেছিল, যাতে তার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, তৎক্ষণাৎ শহীদ করতে পারে। এ জন্যেই স্বয়ং হযরত হাসান আসকারীকেও (আ.) তার যৌবনেই তারা শহীদ করেছিল।

কি প্রভুর প্রত্যয় ছিল এটাই যে, হযরত মাহদী (আ.) জন্মগ্রহণ করবেন এবং মানবতার মুক্তির জন্যে সঞ্চিত থাকবেন। আর এ কারণেই তার পিতার জীবদ্দশায় (পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত) শিয়াদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যতীত [১৭০], অন্য কেউ তাকে দেখেননি এবং তিনি তার মহান পিতার শাহাদাতের পর চারজন ব্যক্তির মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, যাদের প্রত্যেকেই পরম্পরায় প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অতঃপর অনির্দিষ্টকালের জন্যে 'গাইবাতে কোবরা' শুরু হয়েছে এবং যে দিন মানব সমাজ বিশ্বজনীন ঐশী শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হবে, সেদিন মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি আত্ম প্রকাশ করবেন।

অতএব হযরত মাহদীর (আ.) গাইবাতের প্রকৃত রহস্য হল এই যে, স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারীদের দুস্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকা। এছাড়া কোন কোন রেওয়ায়েতে অন্যান্য হিকমতের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মানুষকে পরীক্ষা করার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ চূড়ান্ত দলিল সু ষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ার পর মানুষ কতটা অবিচলতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে তা পরীক্ষা করা।

তবে লোকান্তরের সময় মানুষ হযরত মাহদীর (আ.) করুণা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়নি এবং কোন এক রেওয়ায়েতের ভাষায় - মেঘের আড়ালে বিদ্যমান সূর্যের[১৭১] ন্যায় কিছুটা হলেও তার দ্যুতি মানুষের নিকট পৌছে। যেমনকরে অসংখ্য মানুষ (যতই অপরিচিত অবস্থায়ই হোক না কেন) তার সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত সমস্যাসমূহের সমাধানে

সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত মাহ্দী (আ.)- এর বিদ্যমানতা হল মানুষের আস্থাশীলতা ও অনুপ্রেরণার গুরুত্বপূর্ণ কারণ যাতে আত্মসংশোধণের মাধ্যমে হযরত মাহ্দী (আ.)- এর আত্মপ্রকাশের জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে।

তথ্যসূচী:

১. উল্লেখ্য : প্রসংগক্রমে পবিত্র কোরানের কিছূ কিছূ আয়াত উদ্ধৃত হয়েছিল, তবে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে নয় বরং ঐ বিষয়ে কোরানের বক্তব্যেও প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্তে।

২.যদি দর্শন ও কালামশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলো যথাক্রমে A সেট ও B সেটের সদস্য হয়,তবে তাদের সম্পর্ককে AXB রূপে দেখানো যায়। অর্থৎ A সেটের কিছু কিছু সদস্য B সেটের সদস্যদের অনুরূপ, আবার কিছু কিছু ভিন্ন রকমের।

৩. এ দলিলটি তত্ত্বীয় বিষয় (বিদ্যমান) থেকে কার্যকরী বিষয়ের (করণীয়) ও কার্যের জন্যে কারণের অপরিহার্যতার যৌক্তিক প্রমাণের দৃষ্টান্তসমূহ থেকে অর্জিত ফলাফল ও অনূরূপ প্রভুর কারণত্বের প্রমাণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

৪. সূরা হুদ- ৭, সূরা কাহাফ- ৭, সূরা মূলক- ২, সূরা মায়িদাহ- ৪৮, সূরা আনা'ম- ১৬৫।

৫. সূরা আনা'ম- ৩৫, ১০৭, ১১২, ১৩৭, ১২৮, সূরা ইউনুছ- ৯৯, সূরা হুদ- ১১৮, সূরা নাহল- ৯, ৯৩ সূরা শূরা- ৮, সূরা শুয়ারা- ৪, সূরা বাকারা- ২৫৩।

৬. সূরা আম্বিয়া- (৭৮- ৮২), সূরা কাহাফ (৮৩- ৯৭), সূরা ছাবা (১০- ১৩) উল্লেখ্য কয়েকটি রেওয়ায়েত অনুসারে, যুলক্বারনাইন নবী ছিলেন না বরং আল্লাহর ওলী ছিলেন বলে জানা যায়।

৭. সূরা ইফসুফ- ৫৫।

৮. নাহজুল বালাগাহ্ খোতবায়ে ক্বাসেয়াহ, সূরা যোখরোফ- (৩১- ৩৫)।

৯. সুরা আম্বিয়া- (৮১- ৮২), সূরা নামল- (১৫- ৪৪)।

১০. সূরা শুয়ারা- ১৯৩; সূরা তাক্বির- ২১; সূরা আ'রাফ- ৬৮; সূরা শুয়ারা- ১০৭, ১২৫, ১৪৩, ১৬২, ১৭৮; সূরা দোখান- ১৮; সূরা তাকবির- ২০; সূরা নাজম- ৫; সূরা আলহাকাহ (৪৪- ৪৭); সূরা জিন্ন (২৬- ২৮)।

১১. লক্ষ্যণীয় (مخلص) (ل এর উপর ফাতহ) (ل এর নীচে জার) থেকে আলাদা। প্রমটির অর্থ হল : আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ (خالص) করেছেন। আর িতীয়টির অর্থ হল : কোন ব্যক্তি তার কর্মগুলোকে নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করেন ।

১২. কোরান এ সম্পর্কে বলে : (সরা আহযাব- ৩২) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

- হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও.

১৩. যেমনটি রেওয়ায়েতে এসেছে :يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد

- আলেমের একটি গুনাহ ক্ষমা করার পূর্বে জাহেলের সাত্তরটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

১৪. আয়াত শব্দটি অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যব ত হয়। উদাহরণতঃ উল্লেখযোগ্য বিদ্যমান বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রভুর জ্ঞান, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নিদর্শন- হোক সে সাধারণ বা অসাধারণ।

১৫. সূরা রা'দ- ৩৭, সূরা গাফির- ৭৮।

১৬. সূরা আল ইমরান- ৪৯, সূরা মায়িদাহ্- ১১০

১৭. এ বইয়ের প্রথম খণ্ডের পাঠ- ৪ ও িতীয় খণ্ডের পাঠ- ১ দ্রষ্টব্য।

১৮. সূরা ইসরা- ৭৭, সূরা আহযাব- ৬২, সূরা ফাতির- ৪৩, সূরা ফাতহ- ২৩

১৯. নিশ্চিত পরিমাণ বা কাদরুলমোতায়াকান হল উসূলে ফিকাহর একটি পরিভাষা।

২০. সূরা আনআম- ৩৭, ১০৯; সূরা ইউনুস- ২০; সূরা রা'দ- ৭; সূরা আম্বিয়া- ৫

২১. সূরা আনআম- ৩৫, ১২৪; সূরা তোহা- ১৩৩; সূরা সাফফাত- ১৪; সূরা কামার ২; সূরা শুয়ারা- ৩, ৪, ১৯৭; সূরা ইসরা- ৫৯; সূরা রূম- ৫৮।

২২. সূরা আনআম- ২১, ৯৩, ১৪৪; সূরা আ'রাফ- ৩৭; সূরা ইয়ুনুস- ১৭; সূরা হুদ- ১৮; সূরা কাহাফ- ১৫; সূরা আনকাবুত- ৬৮; সূরা শূরা- ২৪।

২৩. সূরা মায়িদাহ- ৪৮; সূরা হাজ্জ- ৬৭।

২৪. সূরা বাকারা- ১৩১, ১৩৭, ২৮৫; সূরা আলে ইমরান- ১৯, ২০।

২৫. সূরা শুরা- ১৩; সূরা নিসা- ১৩৬, ১৫২; সূরা আলে ইমরান (৮৪- ৮৫)।

২৬. সূরা নিসা- ১৫০; সূরা বাকারা- ৮৫।

২৭. সূরা ফাতির- ২৪; সূরা নাহল- ৩৬।

২৮. সূরা বাকারা- ২৪৬, ২৫৬।

২৯. রেসালেয়ে এ' তেক্বাদাতে সাদুক এবং বিহারুল আনওয়ার (নতুন সংস্করণ) খণ্ড- ১১, পৃঃ ২৮, ৩০, ৩২, ৪১।

৩০. সূরা বাকারা- ২১৩, সূরা নিসা- ১৬৫

৩১. বিহারুল আনোয়ার , খণ্ড- ১১ পৃষ্ঠা : ৩২

৩২. সূরা মারিয়াম- ৫১, ৫৪।

৩৩. উসূলে কাফি, খণ্ড- ১, পৃঃ- ১৭৬।

৩৪. সূরা বাকারা- ২৫৩, সূরা ইসরা- ৫৫।

৩৫. সূরা বাকারা- ১২৪, সূরা আম্বিয়া- ৭৩, সূরা সাজদাহ্- ২৪।

৩৬. সূরা আহকাফ- ৩৫।

৩৭. বিহারুল আনায়ার, খণ্ড- ১১, পৃঃ- (৩৩- ৩৪) ও মুয়ালিমুন্নাবাবুয়াহ : ১১৩।

৩৮. সূরা আলে ইমরান- ৮১।

৩৯. সূরা আনআম- ৯০; ইয়াসীন- ২১; তুর- ৪০; কালাম- ৪৬; ইউনূস- ৭২; হুদ ২৯, ৫১ ; ফোরকান- ৫৭; শূয়ারা- ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০; ইউসূফ- ১০৪; সাদ- ৮৬।

৪০. সূরা আহকাফ (২৯- ৩২)।

৪১. সূরা জিন্ন (১- ১৪)।

৪২. সূরা নাহল- ৩৬, সূরা আম্বিয়া- ২৫, সূরা ফুস্সিলাত- ১৪, সূরা আহক্বাফ- ২১।

৪৩. সূরা ইব্রাহীম- ৯, সূরা মু'মিনুন- ৪৪।

৪৪. সূরা সাবা- ৩৪।

৪৫. গাফির- ৮৩, কাসাস- ৭৮, যুমার- ৪৯।

৪৬. আহযাব- ৬৭, সাবা (৩১- ৩৩)।

৪৭. সূরা হুদ- ৪০, (২৭- ৩১)।

৪৮. সূরা মায়িদা- ৭০।

৪৯. সূরা গাফির- ৫৬, আ'রাফ- ৭৬।

৫০. সূরা বাকারা- ১৭০, সূরা মায়িদা- ১০৪, সূরা আ'রাফ- ২৮, সূরা ইউনুস- ৭৮, সূরা আম্বিয়া- ৫৩, সূরা শুয়ারা- ৭৪ সূরা লুকমান- ২১, সূরা যুখরুফ- (২২- ২৩)

৫১. সূরা হুদ- (৮৪- ৮৬), কাসাস- (৭৬- ৭৯), তওবাহ- ৩৪।

৫২. সূরা ইব্রাহীম- ২১, সূরা ফাতির- ৪৭, হুদ- ২৭, শুয়ারা- ১১১।

৫৩. সূরা হিজর- ১১, সূরা ইয়াসীন- ৩০, সূরা যুখরুফ- ৭, সূরা মুতাফীফফিন (২৯- ৩২)।

৫৪. সূরা আ'রাফ- ৬৬, সূরা বাকারা- ১৩, সূরা মু'মিনুন- ২৫।

৫৫. সূরা আযযারিয়াত- ৩৯, ৫২, ৫৩, আম্বিয়া- ৩, কামার- ২।

৫৬. আনা'ম- ২৫, আনফাল- ৩৪, নাহল- ২৪, মু'মিনুন- ৮৩, ফুরকান- ৫, নামল- ৬৮, আহকফ- ১৭, কালাম- ১৫, মুতাফিফফীন- ১৩।

৫৭. সূরা নূহ- ৭; ফুস্সিলাত- ২৬; সূরা আনআম- ১১২, ১২১; গাফির- ৫, ৩৫; আ'রাফ- ৭০, ৭১; কাহাফ- ৫৬।

৫৮. বাকারা- ১৭০, মায়িদা- ১০৪, আ'রাফ- ২৮, আম্বিয়া- ৫৩, ইউনুস- ৭৮, লোকমান- ২১।

৫৯. ইউনুস- ৮৮, সাবা- ৩৫, কালাম- ১৪, মারিয়াম- ৭৭, মোদ্দাস্সির- ১২, মোজাম্মিল- ১১, আহকাফ- ১১।

৬০. সূরা আনা'ম- (৭- ৯), সূরা ইসরা- (৯০- ৯৫), ফুরকান- (৪- ৮)।

৬১. সূরা বাকারা- ১১৮, সূরা আনআম- ১২৪, সূরা নিসা- ১৫৩।

৬২. সূরা ইব্রাহীম- ১৩, সূরা হুদ- ৯১, সূরা মারিয়াম- ৪৬, সুরা ইয়াসীন- ১৮, সুরা গাফির- ২৬।

৬৩. আনফাল- ৩৬।

৬৪. সূরা ইব্রাহীম- ১২।

৬৫. সূরা বাকারা- ৬১, ৮৭, ৯১, আল ইমরান- ২১, ১১২, ১৮১, সূরা মায়িদাহ- ৭০, সূরা নিসা- ১৫৫।

৬৬. সূরা নিসা- ৬৫, সূরা তোহা- ১৩৪।

৬৭. সূরা আলাক- ৬।

৬৮. সূরা আনআম- ৪২, সূরা আ'রাফ- ৯৪।

৬৯. সূরা আনআম- ৪৩, সূরা মু'মিনুন- ৭৬।

৭০. সূরা আ'রাফ- ৯৫।

৭১. সূরা আ'রাফ- ১৮২, ১৮৩, আলে ইমরান- ১৭৮, তওবাহ- ৫৫, ৮৫, মু'মিনুন (৫৪- ৫৬)।

৭২. সূরা আলে ইমরান- ১৪৬।

৭৩. সূরা তওবাহ- ১৪।

৭৪. সূরা আনকাবুত- ৪০ এবং এমন অনেক ক্ষেত্র।

৭৫. সূরা ফাতির- ৪৩, সূরা গাফির- ৮৫, সূরা ইসরা- ৭৭।

৭৬. তৌরাত : সৃষ্টির যাত্রা, তৃতীয় অধ্যায় (১২- ৮০) সংখ্যা।

৭৭. তৌরাত : সৃষ্টির যাত্রা ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

৭৮. তৌরাত : সৃষ্টির যাত্রা ৩২তম অধ্যায় (২৪- ৩২) সংখ্যা।

৭৯. পুরাতন সংস্করণ, িতীয় পুস্তক স্যামুয়েল, ১১শ অধ্যায়।

৮০. তৌরাত : সৃষ্টির যাত্রা ১৯- তম অধ্যায়, (৩০- ৩৮) সংখ্যা।

৮১. তৌরাত : িতীয় যাত্রা, ৩৪- তম অধ্যায়।

৮২. ইঞ্জিল ইউহান্না, িতীয় অধ্যায়।

৮৩. আজহারুল হাক, লিখক রহমাতুল্লাহ হিন্দী; আল হুদা ইলা ীনিল মুস্তাফা, লেখক- আল্লামা বালাগি, রাহে সা ' দাত, লেখক- আল্লামা শা ' রানী।

৮৪. সুরা জুময়াহ- ২, ৩।

৮৫. নাহাজুল বালাগাহ খোৎবা নং- ১৮৭।

৮৬. সূরা সাফ- ৬,

৮৭. সূরা আ'রাফ- ১৫৭, বাকারা- ১৪৬, আনা'ম- ২০

৮৮. বাকারা- ৮৯।

৮৯. সূরা মায়িদা- ৮৩, আহকাফ- ১০।

৯০. উদাহরণতঃ মির্জা মুহাম্মদ রেজা (ইহুদী পণ্ডিত, তেহরান) যিনি ইক্বামাতুশশুহুদ ফী রাদ্দিল ইয়াহুদ বইয়ের লেখক, হাজী বাবা কাযভিনি ইয়াযদী (ইহুদী আলেম) যিনি 'মাহজারু শশুহুদ ফী রাদ্দিল ইয়াহুদ ' বইয়ের লেখক অধ্যাপক অব্দুল আহাদ দাউদ (প্রাক্তন ীষ্টান বিশপ) যিনি 'মুহম্মদ দার তৌরাত ও ইঞ্জিল ' বইয়ের লেখক, প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৯১. বিহারুল আনোয়ার ১৭- তম খণ্ড, পৃঃ- ২২৫ থেকে ১৮- তম খণ্ডের শেষ পর্যন্ত এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহ ও বিশস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ।

৯২. সূরা ইসরা- ৮৮।

৯৩. সূরা হুদ- ১৩।

৯৪. সূরা ইউনুস- ৩৮।

৯৫. সূরা বাকারা- ২৩, ২৪।

৯৬. উসুলে কাফি, খণ্ড- ১, পৃঃ- ২৪।

৯৭. আ ' লামুল ওয়ারি : পৃঃ ২৭, ২৮ পৃঃ ৪৯, সীরাতে ইবনে হিশাম : খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ২৯৩, ৪১।

৯৮. সূরা আর রাহমান- ৬৪।

৯৯. যেমন : যে সকল রেওয়ায়েত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাগুলোর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনায় ব্যব ত হয়েছে অথবা ভ্রান্ত ব্যাখ্যাসমূহে ও তাৎপর্যগত বিচ্যুতির পরিবর্জনে ব্যব ত হয়েছে, সেগুলো থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, কোন শব্দ বা বিষয়ের বাদ পড়ার স্বপক্ষে দলিল বিদ্যামান।

১০০. মহানবী (সা.) এর পত্রসমূহ ইতিহাসের একাধিক বিশস্ত গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে 'মাকাতিবুর রাসূল ' নামক গ্রন্থে এ গুলোকে একত্র করা হয়েছে।

১০১. বাকারা- ২১, নিসা- ১, ১৭৪, ফাতির- ১৫।

১০২. আ’রাফ- ২৬, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৫, ইয়াসীন- ৬০।

১০৩. বাকারা- ১৮৫, ১৮৭, আল ইমরান- ১৩৮, ইব্রাহীম- ১, ৫২, জাছিয়া- ২০, যুমার- ৪১, নহল- ৪৪, কাহাফ- ৫৪, হাশর- ২১।

১০৪. আনআম- ৯০, ইউসুফ- ১০৪, সাদ- ৭৮, তাক্বভির- ২৭, কালাম- ৫২।

১০৫. নিসা- ৭৯, হাজ্জ- ৪৯, সাবা- ২৮।

১০৬. আম্বিয়া- ১০৭, ফোরকান- ১।

১০৭. আনআম- ১৯।

১০৮. আল ইমরান- ৬৫, ৭০, ৭১, ৯৮, ৯৯, ১১০, মায়িদাহ- ১৫, ১৯।

১০৯. তওবাহ- ৩৩, ফাতহ- ২৮, সাফ- ৯।

১১০. তাওবাহ- ৩৩, ফাতহ- ৩৮, সাফ- ৯।

১১১. কাফি খণ্ড- ১, পৃঃ- ৫৭, খণ্ড- ২, পৃঃ- ১৭, বিহার খণ্ড- ২, পৃঃ- ২৬০ খণ্ড- ২৪, পৃঃ- ২৮৮ ওয়াসায়েলুশিয়া খণ্ড- ১৮, পৃঃ- ১২৪।

১১২. শুয়ারা- ২১৪, আনআম- ৯২, শুরা- ৭, সিজদাহ- ৩, কাসাস- ৪৬, ইয়াসীন- ৫, ৬।

১১৩. বিহারুল আনোয়ার খণ্ড : ৩৭, পৃষ্ঠাঃ- ২৫৪- ২৮৯, সহীহ বোখারী খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ- ৫৮, সহী মুসলিম খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠা :- ৩২৩, সুনানে ইবনে মাজাহ্ খণ্ড : ১, পৃঃ- ২৮, মূস্তাদরাকুল হাকিম খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠা :- ১০৯, মুসনাদি ইবনে হামল খণ্ড ১, পৃঃ- ৩৩১, খণ্ড ২, পৃঃ- ৩৬৯, ৪৩৭।

১১৪. ওয়াসায়েলুশিয়া : খণ্ড- ১, পৃঃ- ১৫, খিসাল খণ্ড- ১পৃঃ- ৩২২, খণ্ড- ২পৃঃ- ৪৮৭।

১১৫. ওয়াসায়েলুশিয়া : খণ্ড- ১৮, পৃঃ- ৫৫৫, মান লা ইয়াহযুরুহুল ফকিহ : খণ্ড- ৪, পৃঃ- ১৬৩, বিহারুল আনোয়ার : খণ্ড- ২২, পৃষ্ঠ- ৫৩১, কশফুলগাম্মাহ : খণ্ড- ১, পৃঃ- ২১।

১১৬. ‘নাহজুল বালাগাহ ’ খুতবাহ- ১, ৬৯, ৮৩, ৮৭, ১২৯, ১৬৮, ১৯৩, ২৩০।

১১৭. এ বইয়ের ি তীয় খণ্ডে ৯ নং পাঠ দ্রষ্টব্য।

১১৮. আল ইমরান- ৩২, ১৩২, নিসা- ১২, ১৪, ৬৯, ৮০, মায়িদাহ- ৯২, আনফাল- ১, ২০, ৪৬, তওবাহ- ৭১, নূর- ৫১, ৫৪, ৫৬, আহযাব- ৬৬, ৭১, হুজরাত- ১৪, ফাতহ- ১৬, ১৭, মুহাম্মাদ- ৩২, মুজাদিলাহ- ১২, মুমতাহিনাহ- ১২, তাগাবুন- ১২, জিন- ২৩।

১১৯. আল ইমরান- ১৫২, নিসা- ৪২, ৫৯, ৬৫, ১০৫, মায়িদাহ- ৪৮, হাজ্জ- ৬৭, আহযাব- ৬, ৩৬, মুজাদিলাহ- (৮- ৯), হাশর- ৭।

১২০. আল আহকামুল সালতানিয়াহ, লিখেছেন আবু ইয়ালা এবং 'আস সাওয়াদুল আ ' যাম ' লিখেছেন আবুল কাশিম সামারকান্দি, পৃঃ ৪০- ৪২।

১২১. সৌভাগ্যবশতঃ বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ের উপর একাধিক ভাষায় ও একাধিক পদ্ধতিতে শতসহস্র গ্রন্থ রচনা করে সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জন্যে গবেষণার পথকে বিস্তৃত করেছেন। উদাহরণতঃ আবাকাতুল আনওয়ার, আল গাদির, দালায়িলুস সিদক, গায়াতুল মারাম এবং ইসবাতুল হুদাহ ইত্যাদি গ্রন্থের নাম উল্লেখ যোগ্য । যারা পড়াশুনার যথেষ্ট সুযোগ পান না তারা 'আল মুরাজিয়াত ' নামক একটি বই, যা শিয়া ও সুন্নী দু ' জন মনীষীর মধ্যে বিনিময়কৃত পত্রসমূহের সমাহার, তা পড়তে পারেন। সৌভাগ্যবশতঃ বইটি বাংলায় অনুদিত করা হয়েছে।

১২২. বাকারা : ১৫১, আল- ইমরান- ১৬৪, জুমুআ ' - ২, নাহল- ৬৪, ৬৪, আহযাব- ২১, হাশর- ৭।

১২৩. আল্লামা আমিনি (রঃ) সাতশতজন মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীর নাম তার "আল গাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক লক্ষেরও অধিক হাদীসের বর্ণনাকারী রয়েছে (আল গাদীর, খণ্ড- ৫ পৃঃ- ২০৮)।

১২৪. শারহে নাহজুল বালাগাহ : ইবনে আবিল হাদিদ, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৮৫ খণ্ড- ৪, পৃঃ- ২৩১- ২৬২, এবং আল গাদীর : খণ্ড- ৭, পৃঃ- ১০২- ১৮০।

১২৫. শারহে নাহজুল বালাগাহ : খণ্ড- ১, পৃঃ- ১৪২- ১৫৮ , খণ্ড- ৩, পৃঃ- ৫৭।

১২৬. আল গাদীর : খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৯৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো।

১২৭. আল গাদীর : খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৯৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো।

১২৮. এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে ‘তাফসীর আল মিজান ’ দ্রষ্টব্য।

১২৯. ইঙ্গিত করা হয়েছে সূরা আহযাবের ৬নং আয়াতের প্রতি النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

১৩০. এ হাদীসের সনদের বৈধতার চূড়ান্ত দলিলের জন্যে “আবাকাতুল আনওয়ার এবং আল গাদীর ” গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৩১. গায়াতুল মারাম, অধ্যায়- ৫৮, হাদীস নং- ৪ (ফারায়িদ হামভীনি)।

১৩২. বিস্তারিত জানার জন্যে ‘ তাফসির আল মিজানের ’ - এ আয়তটি দ্রষ্টব্য।

১৩৩. এ বিষয়টি আহলে সুন্নাতের মনীষীগণ মহানবী (সা.) এর সাতজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন : যাইদ ইবনে আরকাম, আবু সাঈদ খুদরী ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী, বারা ’ ইবনে আযিব, আবু (হারায়রা ও ইবনে মাসউদ (আল গাদীর : খণ্ড- ১)।

১৩৪. আবাকাতুল আনওয়ার ’ আল গাদীর, আল মুরাজিয়াত।

১৩৫. গায়াতুল মারাম, খণ্ড- ১০, পৃঃ- ২৬৭ , ইসবাতুল হুদা, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১২৩, ইউনাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃঃ- ৪৯৪।

১৩৬. এ হাদীসটিও বহুল প্রচারিত হাদীসসমূহের একটি যা তিরমিযি, নাসাঈ ও মোস্তাদরাকের লেখক কর্তৃক মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৩৭. মোস্তাদরাকে হাকিম, খণ্ড- : ৩, পৃঃ- ১৫১।

১৩৮. মোস্তাদরাকে হাকিম, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১৩৪, পৃঃ- ১১১, সাওয়ায়িকে ইবনে হাজার, পৃঃ- ১০৩, মুসনাদে ইবনে হাম্বল, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৩৩১, খণ্ড- ৪, পৃঃ- ৪৩৮।

১৩৯. মরহুম সাদুকের কামালুদ্দিন ও তামামুন্নিয়ামাহ, বিহারুল আনওয়ার : মাজলিসি।

১৪০. এ আয়াতটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে ‘তাফসীর আলা মিজানে ’ এবং ‘আল ইমামাতু ওয়াল বিলায়াতু ফিল কুরানিল কারিমে ’ দ্রষ্টব্য।

১৪১. গায়াতুল মারাম, পৃঃ- (২৮৭- ২৯৩)।

১৪২. গায়াতুল মারাম, পৃঃ- ২৯৩, খণ্ড- ৬।

১৪৩. গায়াতুল মারাম, পৃঃ- ২৬৫, উসূলে কাফি, খণ্ড- ১, পৃঃ- ২৯৪।

১৪৪. মুস্তাদরাকে হাকিম, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ২২৬, বিস্ময়ের ব্যাপার হল আহলে সুন্নাতের একজন আলেম 'ফাতহুল মুলকুল আলী বিসিহহাতি হাদীসে ' মাদীনাতিন এলমিল আলী ' যা ১৩৫৪ হিঃ কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১৪৫. ইউনাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃঃ- ৮৮, উসূলে কাফি, খণ্ড- ১, পৃঃ- ২৯৬।

১৪৬. উসূলে কাফি : কিতাবুল হুজ্জাহ, পৃঃ- ২৬৪, পৃঃ- ২৭০।

১৪৭. উসূলে কাফি, খণ্ড- ১, পৃঃ- ২৬৮।

১৪৮. কাহাফ (৬৫- ৯৮), আল ইমারান ৪২, মারিয়াম (১৭- ২১), তাহা- ৩৮, কাসাস- ৭।

১৪৯. গায়াতুল মারাম, পৃঃ- (৩৫৯- ৩৬১)।

১৫০. এ হাদীসটির বিশ্লেষণে সু ষ্ট হয় যে, এ বক্তব্যগুলো অবিশস্ত লোকের উপস্থিতির ফলে ব্যক্ত হয়েছে। স্মরণ রাখা উচিৎ যে, অদৃশ্যের জ্ঞান যা একমাত্র মহান আল্লাহরই অওতাধীন তার মানে হল সে জ্ঞান যে জ্ঞান প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর করে না। যেমন : আমীরুল মু ' মিনিন (আ.) এক ব্যক্তির এ প্রশ্নের জবাবে যে, ' আপনি কি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ?'বলেছিলেন : انّما هو تعلم من ذی علم অর্থাৎ বস্তুত : তা জ্ঞানের মালিকের নিকট থেকে লাভ করা হয়। নতুবা সকল নবী এবং আল্লাহর অধিকাংশ ওলী, ওহী অথবা ইলহামের মাধ্যমে যে অদৃশ্য জ্ঞান তাঁদেরকে প্রদান করা হত তা অবগত ছিলেন। এগুলোর সুনিশ্চত উদাহরণ হল সে অদৃশ্য সংবাদ যা হযরত মূসার (আ.) মায়ের প্রতি ইলহাম করা হয়েছিল : (কাসাস- ৭)

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

“নিশ্চয়ই আমরা তাহাকে তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবো এবং প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করবো। ”

১৫১. উসূলে কাফি,খণ্ড- ১,পৃঃ- ২৫৭ (দারুল কুতুবুল ইসলামীয়া অনুসারে)।

১৫২. উসূলে কাফি,খণ্ড- ১,পৃঃ- (১৯৮- ২০৩)।

১৫৩. বিহারুল আনওয়ার,খণ্ড- ২৬,পৃঃ- ৫৮।

১৫৪. উসূলে কাফি,খণ্ড- ১,পৃঃ- ২৫৮।

১৫৫. উসূলে কাফি,খণ্ড- ১,পৃঃ- ২৫৮।

১৫৬. উসূলে কাফি,খণ্ড- ১,পৃঃ- ২৭৩।

১৫৭. মুনতাখাবুল আছার ফিল ইমামিছ ছানিয়া আশার, খণ্ড- ৩, পৃঃ- (১০- ১৪০)।

১৫৮. বিহারুল আনওয়ার, গায়াতুল মারাম, ইসবাতুল হুদাহ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ।

১৫৯. তওবাহ- ৩৩, ফাতহ- ২৮, সাফ- ৯, বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড- ৫১, পৃঃ- ৫০, খণ্ড- ২২, পৃঃ- ৬০, খণ্ড- ৫৮ও ৫৯।

১৬০. বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড- ৫১, পৃঃ- ৫৮, খণ্ড- ৫০, পৃঃ- ৫৪, খণ্ড- ৩৪ ও ৩৫।

১৬১. যেমন এ আয়তসমহূ (ليظهر على الدين كله) (و يكون الدين كله لله) এবং (بقية الله خير لكم ان كنتم مومنين) ইত্যদি।

১৬২. বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড- ৫১, পৃঃ- ৪৪- ৬৪।

১৬৩. শারহে নাহজুল বালাগাহ- ইবনে আবিল হাদীদ, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৫৩৫, সাবায়িকুয যাহাব সুবাইদি, পৃঃ- ৮৭, গায়াতুল মা ’ মূল, খণ্ড- ৫, পৃঃ- ৩৬২।

১৬৪. যেমন : ‘আল বায়ান ফি আখবারি সাহিবিয যামান ’ সপ্তম শতাব্দীর হাফিয মুহাম্মদ বিন ইউসুফ গাঞ্জি শাফিয়ী আল বুরহান ফি আলামাতুল মাহদী আখিরিয যামান ১০ম শতাব্দীর মুত্তাকী হিন্দী কর্তৃক সংকলিত।

১৬৫. সাহীহ তিরমিয়ী, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৪৬, সাহীহ আবুদাউদ, খণ্ড- ২, পৃঃ- ২০৭, মুসনাদে ইবনে হাম্বল, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৩৭৮, ইউনাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃঃ- ১৮৬, ২৫৮, ৪৪০, ৪৮৮, ৪৯০।

১৬৬. আস্আফুর রাগিবিন, পৃঃ- ১৩৪, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী থেকে বর্ণিত।

১৬৭. ইউনাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃঃ- ৪৯৪।

১৬৮. মুনতাখাবুল আছার, পৃঃ- ২৫৫।

১৬৯. মুনতাখাবুল আছার, পৃঃ- ২৫১।

১৭০. উছমান ইবনে সাঈদ, মুহাম্মদ ইবনে উছমান ইবনে সাঈদ, হুসাইন ইবনে রূহ এবং আলী ইবনে মুহাম্মদ সামারী।

১৭১. বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড- ৫২, পৃঃ ৯২।

সূচীপত্র

ł N̦S̃R΄'n দōg কথা 4

মানুষের K̦R ৯ ওহী ও ł N̦S̃R΄'n দRSōK̦ł ŒEl΄o 9

į RSį জিদR'n জবাব 15

নবীগণের ŃŒEl΄o 22

নবীগণের ŃŒEl΄ón ম্মŃR দলিলসমূহ 30

į RSį জিপর্ঠ ধারণার জবাব 38

মু'জিযাহ 47

į RSį জিপর্ঠ ধারণার জবাব 53

নবীগণের ŒERjŌōNÓ 59

জনগণ ও নবীগণ 66

ইসলামের নবী (সা.) 72

ŃŒE źį ónR'n ģRNsŒEį অ 78

źį ónd বিকৃতি źŁR NŒ 86

ইসলামের ōdN̦K̦ł ŒEl΄o ও ŒEnł l΄o 91

ł N̦S̃R΄'n ŃĈōNóŒE 97

ইমামত 103

ইমাম থাকার দRSōK̦ł ŒEl΄o 108

ইমামের নিয়োগ 114

ইমামের ইসমাত ও ঋd 121
হযরত মাহদী (আ.) 130
l’ L·ঞ্চōĵŒ 139